শুকতারা

ষড়বিংশ বর্ষ • অষ্টম সংখ্যা

আশ্বিন • ১৩৮০

রহস্যময় অভিযাত্রী

অবশেষে যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন দুই পক্ষের সৈন্যরা। বিপুল আয়োজন। কৃষ্ণ নিজে অর্জুনের রথ চালাচ্ছেন।
চারিদিকে তাকিয়ে হঠাৎ অর্জুন বললেন—আমি যুদ্ধ করতে পারব না। কী হবে আপনজনদের হত্যা করে? শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অনেক কিছু বোঝালেন। সে সব কথাই 'গীতা'। তারপর দেখালেন নিজের বিশ্বরূপ।...অনেক হাত অনেক চোখ,...। মুখে জ্বলছে আগুন। বললেন—ওঁরা আগেই মরে আছে, তুমি উপলক্ষ মাত্র। অর্জুন আবার ধনুর্বাণ তুলে নিলেন হাতে।...
অমৃত সমান মহাভারত-কথা
বোরোলীন হাউস কর্তৃক প্রচারিত
শুরু হল যুদ্ধ। তৃতীয় দিনে কৌরবদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ভীষ্ম। দশদিন প্রবল লড়াই করলেন তিনি। পাণ্ডবেরা বিপর্যস্ত। তারপর অর্জুনের শরাঘাতে জর্জরিত হয়ে শর শয্যায় শায়িত ভীষ্ম।
বোরোলীন
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম কাটা-ছেঁড়া-ফাটা, রুক্ষ-শুষ্ক কিংবা ঝলসানো ত্বকের অনবদ্য নিরাময়—।
(চলবে)

বাঁটুল দি গ্রেট

আশ্বিন—

কে এ কাজ করলো? কাউকেই তো দেখছি না!
মুখের কালিটা ধুয়ে ফেলি!
নিশ্চয় এখান থেকে ঐ বিচ্ছুটা ওর খেলনা পিস্তলে কালি ভরেছে!
কালি
অ্যাই! তোরা এখুনি ভেতরে আয়!
শোবার ঘরের বার হলেই টেংরি খোয়া যাবে, এই বলে রাখলুম!
এতক্ষণে শান্তি! ওহ্, না! আবার কে দরজা ঠেঙাচ্ছে!
ঠক! ঠক!
যা ভেবেছি তাই! ওপরের জানলা থেকেই দরজা ঠোকার কাজ চালাচ্ছে!
আমিও মজা দেখাচ্ছি! দরজার ফাঁক দিয়ে মেঝেয় পাতা সতরঞ্চির কোনা বেরিয়ে আছে। এই দিয়েই ওদের কুপোকাৎ করবো!
হেইয়ো!
আঁউলুক!
হোঃ হোঃ! এবার আমি কানে ছিপি এঁটেছি! কোন শব্দই আমার কানে আর ঢুকবে না!
বাঁটুলদা, বাঁটুলদা! আমাদের ঢুকতে দাও! দেখ আমাদের তালুতে কি রকম বেদনাদায়ক আলু গজিয়ে উঠছে!
এখন আর তোমার সঙ্গে রসিকতা করছি না!

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine vide No. 321 (9)-T. B. C.

(Dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)

সূচীপত্র—আশ্বিন, ১৩৮০

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১	রহস্যময় অভিযাত্রী	নারায়ণ দেবনাথ	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট	নারায়ণ দেবনাথ	প্রথম ছবি
৩।	আসল কথা (কবিতা)	শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৪১
৪।	মরণ হরণ নীলপদ্ম (রূপকথা)	শোভা চৌধুরী	৫৪২
৫।	দেহান্তরী (বিদেশী গল্প)	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	৫৪৮
৬।	এক দিনের রাজা (গল্প)	নীহারেন্দু দাস	৫৫৭
৭।	বল দেখি (মজার ছবি)	—	৫৬৩
৮।	সোনা ও রূপা (ছবিতে গল্প)	দিলীপ দাস	৫৬৪
৯।	জাদুকর বৈজ্ঞানিকের গল্প (জীবন কথা)	শ্রীবিশ্বনাথ দাস	৫৬৬
১০।	প্রতীহার-সম্রাট বৎসরাজ (অমরবীর কাহিনী)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার	৫৭০
১১।	দুইয়ে দুইয়ে চার (মজার কথা)	—	৫৭৮
১২।	ভাড়াটিয়ার জন্য (মজার ছবি)	—	৫৭৮
১৩।	একটি ইতিহাস বিখ্যাত চোর (গল্প)	জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৭৯
১৪।	৫৬৩ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর	—	৫৮২
১৫।	সোনার ঘণ্টা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	অনিল ভৌমিক	৫৮৩
১৬	ছেলে মাথায় ওঠে (রিপ্লে থেকে)	—	৫৯১
১৭।	হাঁদা-ভোঁদার ফুটবল ম্যাচ (ছবিতে গল্প)	—	৫৯২
১৮।	জাবালুজা ও টারজান (অ্যাডভেঞ্চার)	সব্যসাচী	৫৯৪
১৯।	জীবন্ত মাটির মূর্তি (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	অজিতকুমার সু	৬০২
২০।	অলৌকিক (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	শশাঙ্কশেখর ঘটক	৬০৫
২১।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)	—	৬০৭
২২।	"৺শ্রীপদ দে স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)		৬০৯

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ৮০ পয়সা

গুপ্তধনের খোঁজে রাম আর শ্যাম
দুই বন্ধুর দায় হ'ল আর ঘরে থাকা কাগজ পেল গুপ্তধনের নকশা আঁকা
বীরের মত অ্যাডভেঞ্চার করার আশায় ঝটপট ওরা সমুদ্দুরে নৌকা ভাসায়
এমনিতে বেশ নির্ঝঞ্ঝাট ক'দিন গিয়ে হঠাৎ দ্যাখে তুফান এলো ঘূর্ণী নিয়ে
অ্যাডভেঞ্চার খুব জমল দারুণ ঝড়ে ভেসে এসে ওরা একটা চরে পড়ে
বেশ কিছুক্ষণ এধার ওধার ঘুরে ঘুরে দেখতে পেল ছোট্ট কুঁড়ে খানেক দূরে
একটা বুড়ো ঝিমুচ্ছিল নাক ডাকিয়ে নকশা দেখে বেবাক অবাক রয় তাকিয়ে
খাও বাছারা গুপ্তধনের সেরা পপিন্স মিষ্টি ফলার বীর বাচ্চার প্রাইজ-পপিন্স
খেতে ভাল·দেখতে ভাল·ভাবতে ভাল
পার্লে
পপিন্স
ফলের স্বাদেভরা লজেন্স
PARLE POPPINS
৫ রকম ফলের স্বাদে ভরপুর-
রাস্পবেরী, আনারস, লেবু, কমলালেবু ও মৌসম্বী।
প্রত্যেক প্যাকেটে ১৩টি লজেন্স

শুকতারা

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ

৮ম সংখ্যা

১৩৮০, আশ্বিন

আসল কথা

শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাস্তবাগীশ খাস্তনবীশ
আস্ত ক'পিস পাঁউরু
গপাৎ করে গিলেই শুধু
কালচে করেন চোখ দুটি !
খাস্তা গজার দিস্তে ধরে
ওজন করেন সস্তা দরে
মস্ত বড়ো কাস্তে নিয়ে
খেতেই বসেন কাটেন না
গপাৎ করে গেলেন শুধু
হাসেন না বা কাশেন না।

খাস্তনবীশ ব্যস্ত অতি
উদরে তার বৃহস্পতি
বৃহৎ কিছু খাদ্য বিনা
খাওয়াটা তাঁর শানায় না।
বস্তভরা চপ না হলে
টিফিনটি তাঁর মানায় না !
খাস্তনবীশ খান যে কত
বোঝেন না তাঁর অতো শত
গেলেন শুধু জানেন না স্বাদ
পেলেন কিনা পেলেন না।

কী ই বা করেন ? দাঁত নেই তাই
চিবিয়ে খাবার খেলেন না।

মরণ হরণ নীলপদ্ম

শোভা চৌধুরী

মোহনগড়ের রাজা মহেন্দ্রবিজয়। অগাধ ঐশ্বর্য, তেমনি বীরত্ব। দুই রানী এবং দুজনের দুটি মেয়ে। কিছুদিন আগে বড় রানী মারা গেছেন, বছর বারো বয়সের মেয়ে মুঞ্জাকে রেখে। মুঞ্জা অপূর্বসুন্দরী, খুব বুদ্ধিমতী, শান্ত প্রকৃতির মেয়ে, সবার 'পরেই তার মায়া-মমতা। এজন্য পিতা রাজা মহেন্দ্রবিজয়ও তাকে বড় ভালবাসেন। তাঁর ছেলে নেই, ভেবে রেখেছেন ভবিষ্যতে মুঞ্জার হাতেই রাজ্যভার দেবেন। সেভাবেই তাকে শিক্ষাদীক্ষাও দিচ্ছেন। বড় রানীর প্রিয় দাসী মালতীকে দিয়েছেন তার দেখাশোনার ভার। সরল, হাসিখুশী মেয়ে মুঞ্জাকে ভালবাসে সকলেই, কেবল দেখতে পারে না দুজন, সে ছোট রানী আর তার মেয়ে গুঞ্জা। তার ওপর তাদের যেমনি হিংসা, তেমনি রাগ। কারণ গুঞ্জা দেখতে তেমন ভাল নয়, ভীষণ হিংসুটে আর বদমেজাজী। ছোট রানীর রাগ রাজা তাকে রাজ্য দেবেন। সর্বদা ভাবেন মেয়েটা মোলে বাঁচেন। মা'টা গেছে, এবার মেয়েটা গেলে নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু মেয়েটার এমন স্বাস্থ্য যে কখনও অসুখ-বিসুখ করে না। কিন্তু সুযোগ এলো হঠাৎ। পাশের এক রাজার সঙ্গে মহেন্দ্র-বিজয়ের যুদ্ধ বেধে গেল। তিনি সৈন্য সাজিয়ে যুদ্ধে চলে গেলেন। এতদিন মনে যত হিংসা রাগই থাক ছোট রানী করতে পারেননি কিছুই, শুধু রাজার ভয়ে। তিনি চলে যেতেই গোপনে ডেকে পাঠালেন প্রাসাদরক্ষকদের সর্দারকে। তার সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ করলেন।

মুঞ্জাকে বললেন, তার মামা, মামী খবর পাঠিয়েছেন, তাকে তাঁরা এতদিন একবারও

দেখেননি, তাই তাকে একবার তাঁদের বাড়ি নিয়ে যেতে চান। তাই তিনি ভেবেছেন, কাল সকালেই তাকে সর্দারের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন। তবে গ্রাম, বনের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে হয় তিন দিন, সে কি পারবে?

শুনে, আনন্দে অধীর মুঞ্জা। মায়ের কাছে মামাবাড়ির কথা সে অনেক শুনেছিল। আজ সেখানে যেতে পাবে, তার চেয়ে আনন্দ আর কি আছে, কত আনন্দের স্বপ্ন দেখে সে। পরদিন ভোরে যাবার সময় দাসী মালতী লুকিয়ে তার হাতে একটি ন্যাকড়ায় বাঁধা পুঁটলি দিয়ে বলে—"আমি গরিব মানুষ, তোমায় কি আর দিতে পারি? তুমি চালভাজা খেতে ভালবাসতে, আমার কাছে লুকিয়ে খেতে, দুটি বেঁধে দিলাম, পথে যেতে খেয়ো। লুকিয়ে নিয়ো, রানীমা দেখলে রাগ করবে।"

পায়ে হেঁটে চলেছে মুঞ্জা, ছোট গ্রাম, নদী, বন, প্রান্তর পার হয়ে।

যায় যায় কত দূর যায়, শেষ হোল দুদিনের পথ, মামাবাড়ি আর দূরে নেই। সর্দারের সঙ্গে কিছু খাবার ছিল, তাই খেয়েছে। কোন কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বা গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়েছে রাতে। তবু মনে মামাবাড়ির আনন্দের স্বপ্ন দেখে সে। আজ কিন্তু বড় কষ্ট হচ্ছে। সর্দারের সঙ্গের খাবার ফুরিয়েছে। সেই ভোর থেকে হাঁটছে কিন্তু কিছু খেতে পায়নি সে। চলেছে এক গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে। মানুষের বসতির চিহ্নমাত্র নেই সেখানে। বেলা দুপুর, মাথার ওপরে গাছের মাথায় লতা জড়িয়ে যেন প্রায় ভোরের অন্ধকার, সূর্য দেখা যায় না।

সে রাজকন্যা, জীবনে রাজপ্রাসাদের বাইরে আসেনি, মন তার ভয়ে ভাবনায় দিশেহারা। হেঁটে হেঁটে পা ফুলে গেছে, কাঁটায় ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে, আর চলতে পারে না সে। সর্দার বলেছে সঙ্গের খাবার ফুরিয়েছে। সকাল থেকে কিছু খায়নি, তেষ্টায় গলা কাঠ। এ কিরকম মামাবাড়ি যাওয়ার আনন্দ?

এমন জানলে সে কি বাড়ি ছেড়ে আসতো নাকি?

খিদেয় কাঁদতে সর্দার বিষম ধমক দিয়ে, রাঙা চোখে এমন করে চাইল তার দিকে যে ভয়ে আর একটি কথাও বলেনি, শুধু লুকিয়ে চোখ মুছছে আর পথ হাঁটছে। কিন্তু আর যে হাঁটতেও পারছে না, কি হবে? মামাবাড়ি কি পৌঁছতে পারবে না সে?

দুপুর গিয়ে বিকেল এলো, সূর্য বসল পাটে। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাল, ঘুরঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে গেল নিবিড় অরণ্যানী। হোঁচট খেয়ে পা কেটে একটা মোটা অশ্বত্থগাছের তলায় ধপাস করে বসে পড়ে সে।

কেঁদে বলে—"আর যে চলতে পারছি না সর্দারদা, এবার মরে যাব।"

কি ভেবে সর্দার বলে—"আচ্ছা বোস।"

ভয়ে থরথরিয়ে কেঁপে কাঁদতে লাগল মুঞ্জা।

বসা নয়, শুয়ে পড়ে মুঞ্জা। পরমুহূর্তেই সারাদিনের খিদেয় কাতর, ক্লান্ত শরীর নিয়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে সে।

হঠাৎ বাঘের গজনে ঘুম ভেঙে উঠে বসে মুঞ্জা, ভয়ে চিৎকার করে ওঠে—"সর্দারদা ?"

কিন্তু কে কোথায়, কারো সাড়া নেই। শুধু হিংস্র পশুর ভয়ংকর গর্জনটা যেন তার পানেই এগিয়ে আসে।

মুহূর্তে মনে হয় সে ভীষণ বোকা, মামাবাড়িটাড়ি ওসব কিছু নয়। ওই লোভ দেখিয়ে তাকে মেরে ফেলতেই জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়েছে ছোটমা। বাঘ, ভালুকে তাকে এখনি খেয়ে ফেলবে। সর্দার ছোটমার হুকুম তামিল করে পালিয়েছে।

ভয়ে থরথরিয়ে কেঁপে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বলে—"হে বৃক্ষ অশথ, মা বলতেন, তুমি নাকি নারায়ণ, সত্য যদি তাই হও, আমায় রক্ষা করো।"

চকিতে গাছটা মড়মড় শব্দে সোজা দুফাঁক হোয়ে গেল, সে তার মধ্যে ঢুকে পড়তেই যেমন ছিল তেমনি জুড়ে গেল। সারা রাত বাঘ ভালুক হাঁ হাঁ করে গাছ আঁচড়াল, তাকে খেতে পারল না।

সকাল হল, আবার ফাঁক হল গাছ, মুঞ্জা বাইরে বেরোল। কিন্তু একি, কোথায় সে গভীর অরণ্য, বাঘ, ভালুকের আস্তানা? এ যে এক চমৎকার উপবন! চারদিকে অপূর্ব রঙ-বেরঙের ফুল গাছ, আর ফুল, অদ্ভুত সৌরভে ছেয়ে আছে সমস্ত দিক। নানা রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে ফুলে ফুলে। সুন্দর সব ফোয়ারায় ঝরছে কত রঙের জল। কিছু দূরে এক মনোহর সরোবর। তার কাঁচের মত জল প্রভাত-সূর্যের রাঙা আলোয় ঢলঢল করছে। তাতে ফুটে আছে অজস্র নীলপদ্ম। অবাক্ হয়ে দেখতে দেখতে সে তার পাষাণ-বাঁধান ঘাটে এসে বসে। এতক্ষণে তার খিদে তেষ্টার বোধ হয়। মনে পড়ে তার কোমরে বাঁধা আছে মালতীর দেওয়া চালভাজার

পুঁটলি, অতো খিদেতেও যা বার করতে পারেনি সর্দারের ভয়ে। হাত মুখ ধুয়ে সেই পুঁটলিটা খোলে, ভাবে—এমন সুন্দর উদ্যানে সে কি করে এলো, কে আনলো? ঘুমের মাঝে কারও তুলে আনাও তো সম্ভব নয়। সে তো গাছের ভেতর ছিল।

হঠাৎ শুনতে পায় অত্যন্ত ক্ষীণ গলায় কে যেন পেছনে বলছে—"ওগো রাজার কন্যে, বাঁচাও দুঃখীর প্রাণ, সাত সাতদিন উপবাসী যায় যে ছেড়ে জান।" চমকে পেছনে ফিরে দেখে, এক থুড়থুড়ে বুড়ী, মাথায় শণের নুড়ি চুল, বলছে সেই।

অবাক্ হয়ে মুঞ্জা বলে—"আমি রাজকন্যা, তুমি জানলে কি করে?"

"আমি জানি।"

"আমার কাছে তো ভাল খাবার কিছু নেই। শুধু এইগুলো আছে।"

চালভাজার পুঁটলিটা সে তার হাতে দিয়ে দেয়।

পরম আনন্দে বুড়ী তাড়াতাড়ি দুটি মুখে ফেলে বলে—"এতেই হবে।"

কি আশ্চর্য, চাল ভাজা মুখে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখে, কোথায় সে বুড়ী?

তার সামনে দাঁড়িয়ে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে, তার পিঠে দুটি ফিনফিনে পাতলা রূপোলী ডানা।

"তুমি কে গো?"

"আমি পরী-রানী। এ বাগান আমার। তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে, আমিও কিছু দিয়ে যাব। এই নাও একটা শুকনো লিচু। এটা মাটিতে পুঁতে দিলেই তক্ষুণি গাছ হবে, ফল হবে। নিজে খাবে, অপরকেও খাওয়াতে পারবে। কিন্তু তুমি খাবার পরেই গাছ শুকিয়ে মরে মিলিয়ে যাবে। একটা ফল রেখে দিও, তাহলে পরদিন আবার হবে। আর নাও এই নীল পদ্মটি, যে কোন রোগে রোগীর মাথায় এটি ঠেকালেই সুস্থ হয়ে যাবে। এ বাগান পরীর মায়া, তুমি এখনই এখান ছেড়ে চলে যাও। পুবদিক ধরে গেলে লোকবসতি পাবে। আমি যাই।"

রূপোলী ডানা মেলে হুস্ করে পরী-রানী আকাশে উড়ে যায়।

সরোবরে এক আঁজলা জল খেয়ে মুঞ্জা বেরিয়ে পড়ে বাগান ছেড়ে।

একটু এসে পথের ধারে লিচুটা পুঁতে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গাছ বেরোয়, বড় হয়, ভারে ভারে ফল ধরে, সে পেট ভরে খায়। সঙ্গে সঙ্গে গাছ মরে যায়। একটা লিচু আঁচলে বেঁধে সে পুবদিকে চলে।

পৌঁছল এসে একটা ছোট্ট গ্রামে। কিন্তু গ্রামটা যেন কেমন খাঁ খাঁ করছে। লোকজন তেমন দেখতে পায় না। এক কুঁড়ের দাওয়ায় একজন বুড়োকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে। এগিয়ে সে বলে,—"আমার কেউ নেই, একটু এখানে থাকতে দেবে?"

বুড়ো বিরক্ত মুখে বলে—"থাকতে পার, কিন্তু খাবে কি ? আমি এ গাঁয়ের চাষী ছিলাম। বানের জলে বউ, ছেলে, জমি সব ভেসে গেছে। গাঁয়ের সবার গেছে। বন জঙ্গল কেটে, সেদ্ধ করে খাচ্ছিলাম, তাও ফুরিয়েছে। এবার বোধহয় সব মানুষের মাংস খাবে।"

"সে কি !"

"হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও বাছা, কি জানি কে ধরে ফেলবে।"

মুঞ্জা হেসে বলে—"না দাদু আমি পালাব না, কাল থেকে গাঁয়ের সবার খাওয়ার ভার আমি নিলাম।"

রয়ে গেল মুঞ্জা। পরদিন সকালে লিচু ফলিয়ে সে সারা গাঁয়ের লোককে খাওয়াল পেটভরে। নিজে সারাদিন উপোস থেকে সেই নিশুতি রাতে খেলো, নইলে গাছ যে মরে যাবে। আবার পরদিনও তাই, এমনি প্রতিদিন। শেষে খেয়ে যা বেশী হয় তা বিক্রি বাজারে করিয়ে চাষীদের গরু, লাঙল কিনিয়ে বর্ষা আসতেই চাষ করাতে লাগল। দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল।

অসময়ে লিচু ফলে, গাঁয়ের বাজারে বাজারে দামে বিক্রি হয়। ক্রমেই সবাই বিষয় সম্পত্তি করতে লাগলো, গাঁ-টা বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো।

সকলেই মুঞ্জাকে ভালবাসে, ভীষণ শ্রদ্ধা করে। ভাবে, তাদের দুঃখে কাতর হয়ে দয়া করে মা লক্ষ্মীই ছদ্মবেশে এসেছেন।

সেদিন হঠাৎ গাঁয়ে হইহই পড়ে গেল, কি ব্যাপার ? হাতী, ঘোড়া, লোক লশকর নিয়ে সে দেশের রাজার সেনাপতি এসেছে। কেন ? রাজার ছেলের ভীষণ অসুখ, আজ দুবছর বিছানায় পড়ে আছে। কত হাকিম, বৈদ্য হার মেনেছে, কেউ সারাতে পারছে না, বুঝতেও পারছে না কি যে রোগ। রাজকুমার ক্রমে ক্রমে মৃত্যুপথে চলেছে। তাই দেশে দেশে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে বেড়াচ্ছে সেনাপতি—যদি কোন হাকিম, বৈদ্য কুমারকে বাঁচাতে পারে, তাকে অর্ধেক রাজত্ব দেওয়া হবে।

মুঞ্জা চাষীদাদুকে বলে,—"বলে এসো আমি সারিয়ে দেবো।"

চাষীবুড়ো ভয় পেয়ে বলে—"সে কি ? কত হাকিম, বৈদ্য যা পারেনি, তুমি ছেলেমানুষ তা পারবে কেমন করে—রাজরাজড়ার ব্যাপার, শেষে কি গর্দান যাবে ?"

মুঞ্জা জেদ করে—"গর্দান যায় যাবে। তুমি বলে এসো।"

অগত্যা দাদু বললে গিয়ে—"আমার নাতনী বলছে সে সারিয়ে দেবে।"

হেসে গড়িয়ে পড়ল সবাই—"কত হাতি গেল তল,—মশা বলে হাঁটু জল। চাষীর মেয়ে সে সারাবে শিবের অসাধ্য রোগ, মেয়েটার মরণ টেনেছে।"

যাই হোক, কি আর করবে! রাজার হুকুম, যে পারবে তাকে নিয়ে যেতে হবে।

পালকি চড়ে রাজবাড়িতে এলো মুঞ্জা চাষীদাদুর সঙ্গে। এসে বললে সে একা যাবে রাজপুত্রের ঘরে। তাই হল। ঘরে ঢুকে অচেতন কুমারের মাথায় নীলপদ্মটি বুলালো মুঞ্জা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে চাইল রাজপুত্র। তারপরেই উঠে বসে খেতে চাইল। খবর গেল রাজার কাছে। সুস্থ হোল কুমার। বহুদিন পরে রাজবাড়িতে আনন্দের হুল্লোড় পড়ল। রাজা মুঞ্জাকে গোপনে ডেকে বললেন—"কে তুমি, দেখে তো চাষীর মেয়ে মনে হচ্ছে না। সত্য বলো।"

কেঁদে ফেললো মুঞ্জা। নিজের সব কথা খুলে বলল। রাজা বললেন,—"মহেন্দ্রবিজয় আমার তো বন্ধু, এখুনি খবর পাঠাচ্ছি, তিনি এখানে আসবেন। কারণ কথা ছিল আমার ছেলেকে যে সারাবে তাকে অর্ধেক রাজত্ব দেবো। কিন্তু তোমায় আমি পুরো রাজত্বই দেবো। ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে আমি অবসর নেবো, তোমরাই হবে রাজা, রানী।"

মহেন্দ্রবিজয় এলেন। বাপ মেয়েতে দেখা হতে আনন্দে দুজনেই কাঁদলেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে মুঞ্জা মামাবাড়ি গেছে শুনে খোঁজ নিয়ে জানলেন সেখানে যায়নি। তখন সব ব্যাপারেরই সন্ধান পেলেন এবং তৎক্ষণাৎ ছোট রানী আর তার মেয়েকে কারাগারে পাঠিয়েছেন। কিন্তু অনেক সন্ধানেও মুঞ্জার খোঁজ পাননি। মুঞ্জা সব শুনে অনুরোধ করে, তার ছোটমা আর বোনকে ক্ষমা করে যেন তিনি তার বিয়েতে আনেন। তাই হোল। মহানন্দে রাজকুমারের সঙ্গে মুঞ্জার বিয়ে হয়ে গেল। পরদিন হোল তাদের রাজ্যাভিষেক। যখন তারা সভার মাঝে সিংহাসনে বসে, সেই সময় হঠাৎ ভয়ে লোকজন ছুটোছুটি করতে লাগলো। এক বিকট দৈত্য আর এক পরী সভায় আসছে। তখনিই তারা পৌঁছল সভায়।

সোজা মুঞ্জার কাছে এগিয়ে এসে পরী বললে,—"শোন মুঞ্জা, তোমার নিশ্চয় মনে হয়েছিল আমি অমন বুড়ী হয়েছিলাম কেন? এই দৈত্যের জন্য। ও বলেছিল, এখন পৃথিবীতে আর দয়া, মায়া, ভালবাসা নেই। এবার এখানে আমরা রাজত্ব করব। আমি বললাম, না, আছে, চিরদিন থাকবে। তোমরা রাজত্ব কোনদিন পাবে না। ও বলল, তোমার কথাই মানবো, যদি খিদেয় কাতর কেউ তার মুখের খাবার তোমায় খেতে দেয়, তাহলে আমি তোমার চাকর হবো, নইলে তুমি হবে আমার দাসী। তোমার খিদের খাবার আমায় দিয়ে, জয়ী করেছ। এই দৈত্য এখন আমার দাস। তাই তোমায় আমরা আশীর্বাদ করতে এসেছি। তুমি সুখে থাক।"

আশীর্বাদ করে কেউ কিছু বলার আগেই তারা চলে গেল। আর কি আশ্চর্য! তারপরেই দেখলে মুঞ্জা তার সেই লিচু আর নীলপদ্মটি কোথায় হারিয়ে গেছে। সে আর কোথাও খুঁজে পেলো না।

● বিদেশী গল্প

দেহান্তরী

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

পাড়াটা জমজমাট, কিন্তু রাস্তাটা সরু। এত সরু যে ওকে গলিও বলা চলে। আর সেই ছোট্ট নোংরা দোকানটা? ঐ গলিরই মাঝামাঝি এক জায়গায়। হাজার-বার ওর সামনে দিয়ে যাতায়াত করলেও নজরে পড়ত না জেনসেন-এর, যদি না ঐ ছোট্ট বিজ্ঞাপনটা লটকানো থাকত জানালার মাথায়।

সবুজ কাপড়ে লাল সুতোয় বোনা এক লাইন বিজ্ঞাপন—"নতুন নতুন জাতের জানোয়ার বানাই।"

চোখ দুটো ঠেলে বেরুল জেনসেন-এর। সে ভিতরে ঢুকল।

"ছয়টা দিন ত আমায়"—বলল সে।

"অত বেশী লোভ করবেন না"—মৃদু আপত্তি জানাল দোকানী। টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট মানুষটি, বামন বললেই হয়। সাদা লম্বা চুল কাঁধের উপরে ঝুলছে, চোখ দুটো জলো, সশব্দে নাক টানছে অনবরত।

বড় বড় চোখে চারদিক একবার দেখে নিল জেনসেন, তারপর বলল—"কাজের কথায় এস হে! পৃথিবীর মাটিতে নেমে এস।"

"আমি ত সেখানেই আছি মশাই"—বলল দোকানী। মাটিতে লাথিও একটা মারল কথাটা প্রমাণ করবার জন্য।

"শুনে খুশী হলাম"—বলে টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ল জেনসেন। তার দুই চোখ ধকধক করে জ্বলছে। বামনের পানে তাকিয়ে বলল—"এই নতুন নতুন জাতের জানোয়ার—কী রকম জানোয়ার হে?"

"রকম?"—বামন জবাব দিচ্ছে—"কোনটা মোটা, কোনটা সরু, কোনটা লম্বা, বেঁটেও কোনটা। পাগলাটেও হয় কোন কোনটা—কত রকম যে হয়, তার সীমা, সংখ্যা নেই।"

"পাগলাটে একটা বোধহয় সামনেই দেখছি"—বলে উঠল জেনসেন।

"ঐ দেয়ালের আয়নাটার দিকে চোখ পড়েছে তাহলে"—জবাব আসে সঙ্গে সঙ্গে।

জেনসেন-এর মর্যাদাবোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, এই তিন পয়সার দোকানীর

সঙ্গে রসিকতার পাল্লা দেওয়া সাজে না তার। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল—"আমি সাংবাদিক—"

"তাইতেই"—দোকানী যেন অনুকম্পায় বিগলিত।

"কী তাইতেই ?"—রেগে ওঠে জেনসেন।

"ঐ পাগলাটে ভাবটা"—

উপর নীচ মাথা নাড়ছে জেনসন—"খুব সপ্রতিভ লোক। আমার খুব পছন্দ সেই সব লোক, যারা চটপট মুখের মতন জবাব দিতে পারে। একটু আধটু ক্ষ্যাপাটে হলেও পছন্দ করি তাদের।"

দোকানী চোখ দুটো মুছল, নাকটা ঝাড়ল, পিটপিট করে চাইল ওর দিকে। তারপর বলল—"বলছেন সাংবাদিক, সাংবাদিকের ভদ্রতার অভাব কেন হবে ?"

"ওটা সাময়িক"—অমায়িক জবাব জেনসেন-এর—"খদ্দের হয়ে এখানে এসে পড়েছি বলে। কটকট কথা কাটাকাটি এমন করে না কোন দোকানী। শুনেছিলাম—দোকানী মহলে একটা চলতি কথাই আছে যে খদ্দের সব সময়েই অভ্রান্ত।"

"সব সময়ে ? মোটেই না"—কাটা জবাব বামনের।

"সব সময়ই"—জোরের সঙ্গে বলে ওঠে জেনসেন—"যদি অবশ্য দোকানীর মতলব থাকে ব্যবসায়ে টিকে থাকবার। থাকুক সে কথা, এই নতুন জাতের জানোয়ার—"

"কী হয়েছে তাদের ?"—নিস্পৃহ প্রশ্ন বামনের।

"বলি, ধাপ্পাটা কী ?"

"আমি বেচি ওসব। এর মধ্যে ধাপ্পাটা কোথায় ?"

"ব-টে আর কি !"—জেনসেন হাউইয়ের মত ফেটে পড়ে—"নতুন জাতের জানোয়ার তৈরি কর ? মানে মিউট্যাণ্ট ? মানে বিবর্ত জীব ? মানে একজাতের জন্তুর দেহে পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে অন্য জন্তু বানানো ? জানো তুমি এ-বিদ্যে ?"

"ঐ আমার ব্যবসা, আমি জানি না ?" বামন জোরে জোরে নাক ঘষছে, টকটকে লাল হয়ে উঠেছে নাকটা।

"জানো ? মিউট্যাণ্ট কাকে বলে, বল তাহলে। মিউট্যাণ্ট, বিবর্ত-জীব, দেহান্তরী জীব ! বল—"

"বলব আবার কী ?"—বামন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে—"ডজনে ডজনে তৈরি করছি। করব কী, ব্যবসার গোপন রহস্য কাউকে জানানো যায় না, তা নইলে ল্যাবরেটরিটা একবার দেখিয়ে দিতাম—"

"সব বাজে ! স্রেফ ধাপ্পা ?" দু'হাত নেড়ে বামনের বক্তৃতা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে

চাইল জেনসেন—"ল্যাবরেটরি? হুঁঃ, মিউট্যাণ্ট হচ্ছে একটা আকস্মিক বিকৃতি, জীব-সৃষ্টির প্রবাহে সনাতন পদ্ধতির একটা ব্যতিক্রম। কদাচিৎ কখনো মহাজাগতিক রশ্মির প্রচণ্ড দাহ যদি এসে পড়ে কোন জীবকোষের উপরে, কিম্ভূতকিমাকার প্রাণী তৈরী হয় তা থেকে—"

"ভুল! বিলকুল ভুল!"—টেবিলের ওধার থেকে টঙ্কার দিয়ে ওঠে বামনের কণ্ঠ—"বিকৃতিও নয়, ব্যতিক্রমও নয়। সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া রয়েছে একটা, যার ফলে জীব বিশেষের দেহে মনে নিয়ে আসা যায় আমূল পরিবর্তন। সেই প্রক্রিয়ারই সৃষ্টি হল মিউট্যাণ্ট, বিবর্তজীব। সেই প্রক্রিয়াতেই কাজ করি আমি। ঠিক যেমনটি চাই, তেমনি জিনিসটিই বার করে আনি ল্যাবরেটরি থেকে।"

"সেই নব সৃষ্টির জিনিসটি আবার সন্তানও উৎপাদন করে নিজের মতন?"—জেনসেন-এর জিজ্ঞাসায় সুস্পষ্ট টিটকারি।

"অবশ্যি"—

"তাহলে ত তুমিই ভগবান"—

বামনের কণ্ঠ হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল—"ভগবানকে অপমান করার ত কোন দরকার দেখছি না"—

এ-ভৎসনার কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে, অন্যদিকে চোখ ফেরাল জেনসেন।

টেবিলের নীচে পায়ার সঙ্গে সঙ্গে তাক লাগানো, আর সবগুলো তাকেই শিশি-বোতল, নানা আকারের—নানা রংয়ের তরল পদার্থে ভরা।

"ওসব কী?"—জিজ্ঞাসা করল অতঃপর।

"শিশি, বোতল, বোয়াম—"

"সে ত দেখতেই পাচ্ছি। কী আছে ওতে? গলানো মিউট্যাণ্ট?"

"আজগুবি প্রশ্ন!"

"আজগুবি প্রশ্ন আমি কখনও করি না"—বলল জেনসেন—"তুমি মিউট্যাণ্ট বিক্রি কর বিবর্তজীব—দেহান্তরী জীব। তাদের একটা খোঁয়াড় বা গুদোম থাকবে ত কোথাও?"

"তা থাকবে বই কি! তবে সেখানে খদ্দেরের যাওয়া বারণ। চাহিদা মত জিনিস এখানে এনেই দেখাব আমি—" জবাব দিল বামন।

"বেশ, তাই দেখাও। গোটাকতক বেশ লাগসই চেহারার মিউট্যাণ্ট—"

"কী রকম জিনিস বেশ পছন্দ তোমার?"

জেনসেনকে ভাবতে হল একটু। "এই ধর—ফিকে নীল গণ্ডার একটা। লম্বা ধর এই সতেরো ইঞ্চি। ওজন—ধর এই নয় পাউণ্ডের মধ্যে।"

"রাখি না। বাজার-চালু জিনিস নয়: তৈরি করতে হবে।"—বলল বামন।

"যা ভেবেছি। তৈরি করতে হবে! বেশ, কয় দিন লাগবে তৈরি করতে?"

"তা দু'হপ্তা," বামন ভেবে বলল—"তিন হপ্তাও লাগতে পারে।"

"তিন মাসও বলতে পারতে। বা তিন বছর! বা গোটা জীবনকাল।"

বামন আপস করতে চায়—"ঐ আকারের মধ্যেই গোলাপী রংয়ের হাতি নেবে একটা? আছে মজুদ—"

"বাজারে অচল"—বিজয়গর্বের হাসি জেনসেন-এর মুখে— "যে কোন চুল কাটার দোকানে ডজনে ডজনে আছে। তাছাড়া ও ত মিউট্যাণ্টই নয়। ব্রেজিলের জঙ্গলে বেঁটে সাদা হাতি আছেই এক জাত, তাদের বাচ্চা হয় ছাগলছানার আকারের, রংও তাদের দুই তিন বছর পর্যন্ত গোলাপীই থাকে।"

টেবিলের উপর সশব্দে এক চাপড় মারল জেনসেন।

[পৃষ্ঠা ৫৫৩

"হ্যাঁ, জানো দেখছি খবরটা।"—স্বীকার করল বামন—"তাহলে আর করা যাবে কী? তোমার কোন কাজে লাগতে পারছি না আমি—"

"সে হবে না"—চেঁচিয়ে ওঠে জেনসেন—"মিউট্যাণ্ট আমার চাই। একটা অন্ততঃ দেখাও। যে কোন রকম।"

"তা যদি বল—" দু'চোখ মুছে, ঘনঘন বারকতক নাক-টানা দিয়ে, পিছনের দরজা দিয়ে বামন বেরিয়ে গেল।

জেনসেন কী করবে ততক্ষণ? চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে? সে পাত্রই সে নয়। ঝুঁকে পড়ল টেবিলের উপর দিয়ে। ও পিঠে হাত বাড়িয়ে নীচের তাক থেকে টেনে আনল হাতে যেটা ঠেকল—সেই বোতলটাই।

ভিতরে দেখা যায়—কমলালেবু রঙের তরল পদার্থ একটা, আধ বোতলের মত। ছিপি

খুলে জিনিসটা শুঁকল জেনসেন। গন্ধটা মনোরম—স্কচ হুইস্কিকে চারগুণ ঘনীভূত করলে যেরকম দাঁড়াবার কথা, সেইরকম যেন। জিভে জল আসছে, তবু ছিপি বন্ধ করে জেনসেন তাড়াতাড়ি বোতলটা যথাস্থানে রেখে দিল।

বামন একটা কুকুরের বাচ্চা এনেছে, তার একটা চোখের চারদিকে কালো বৃত্ত।

"এই নাও, খুব সস্তায় হবে—"

"তা ত হবেই"—বলল জেনসেন—"তোমায় পুলিসে দেওয়া দরকার—"

"কারণ ?"

"ওটা মিউট্যাণ্ট বলতে চাও ?"

খুব যেন আহত হয়েছে মনে মনে, এইরকম ভাবখানা দেখিয়ে বামন বলল—"তুমি বলতে চাও না বুঝি ? বেশ, তাহলে নয় ওটা মিউট্যাণ্ট। তুমিই যখন জহুরী এ-ব্যাপারের।"

কুকুর বাচ্চাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখেছিল, তুলে নিয়ে সে আবার বেরিয়ে গেল পিছনের দরজা দিয়ে। কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে একটা কাণ্ড ঘটল। কুকুর বাচ্চাটা ফিরে তাকাল জেনসেন-এর দিকে, আর নাক সিঁটকে বলে উঠল— "সবজান্তা !"

দোকানী ফিরে এলে জেনসেন বলছে—"কথা কইছিল যেন জন্তুটা। পুতুলনাচের আসরে অনেক কেঠো পুতুলকেও কথা কইতে শোনা যায়।"

"তা যেতে পারে বই কি !"—এমন একটা হাঁচি হাঁচল বামন যে তাকের বোতল-গুলো ঝনঝন করে বেজে উঠল।

জেনসেন বলে যাচ্ছে—"গোড়ায়ই বলেছি—সাংবাদিক আমি। সংবাদ হিসেবে মুখরোচক হবে, এমন কিছু দেখতে পেলে আমি লেগে থাকি তার পিছনে—যতক্ষণ না একটা এস্পার-ওস্পার কিছু হয়ে যায়। এস্পার-ওস্পার ! বুঝেছ ?"

"বুঝেছি বইকি ! এস্পার না হলে কাজেই তখন ওস্পার।"

"বেশ। বোঝ। ভাল করে বোঝ। তোমার বলবার কথা এই যে মিউট্যাণ্ট বেচার ব্যবসা তোমার। ভাল কথা। ও কথা নিয়ে বেশ খানিকটা লেখা যায়। খবরের কাগজে পুরো একটা স্তম্ভই লেখা চলে হয়ত।"

"তাই না কি ?"—বামনের সাদা ভ্রূ দুটো উপর পানে ঠেলে উঠল, খুব যেন সে চিন্তায় পড়েছে এই লেখালেখির কথা শুনে।

জেনসেনকে দেখায় রীতিমত হিংস্র—"ওস্তাদ লিখিয়ের হাত থেকে একটা স্তম্ভ যখন দেখা দেয় কাগজে, তাতে অনেক চিন্তার খোরাক পায় লোকে। ওতে ভাল কথাও থাকে, থাকে বিশ্রী কথাও অনেক। লোকে সবই পড়ে। বিশেষ করে বিশ্রী

কথাগুলো বেছে বেছে পড়ে পুলিসেরা। দামী খবরের জন্য লেখকের কাছে কৃতজ্ঞতার সীমা থাকে না তাদের। কিন্তু তারা তৎপর হয়ে ওঠার আগেই চিড়িয়া এদিকে উড়েছে খবরের কাগজ চিড়িয়ারাও পড়ে কিনা!"

"পড়ে বুঝি?"—উদাসীনভাবেই মন্তব্য করল বামন।

টেবিলের উপরে সশব্দে এক চাপড় মারল জেনসেন—"এক্ষুণি একটা কুকুরছানা তুমি বেচতে এসেছিলে আমার কাছে। কুকুরছানা টিটকারি দিল—'সবজান্তা'। আমি স্বকর্ণে শুনেছি তা। ভেনট্রিলোকুইজম! কথা তুমিই কয়েছিলে। স্বর ছুড়ে মারবার কায়দায় মনে হল কথা কয়েছে কুকুর। এটা ধোঁকাবাজি, ভদ্রভাষায় প্রতারণা। ঠকিয়ে পয়সা নেওয়ার চেষ্টা। চুরিই একরকম।"

"কিন্তু পয়সা ত নিইনি মশাই!"—ডান হাত বারবার ঝাড়তে থাকে বামন, "নিতামও না, তুমি ওটা কিনলেও না।"

"কিনলেও না?"—জেনসেন অবাক্—"মৌফতে দিয়ে দিতে নাকি?"

"না, তাও নয়। দাম হিসেবে চাইতাম অন্য কিছু, পয়সার চাইতে যা আমার দরকার অনেক বেশী।"

বামন চারদিক দেখে নিল একবার, তারপর সামনে ঝুঁকে ফিসফিস করে কী যেন বলল জেনসেনকে। আর তা শুনে জেনসেন-এর চোখ যেন ঠিকরে বেরুতে চাইল একেবারে, এক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল—"এবারে আর বুঝতে বাকী নেই, তুমি বদ্ধ পাগল।"

এতক্ষণে একটু কিন্তু ভাব দেখা গেল বামনের কথায়—"মানে আর কি, মাল-মসলার বড় বেশী অভাব কিনা এ-কারবারে! বিশেষ করে জীবদেহ থেকে যেসব জিনিস সংগ্রহ করতে হয়, সেই সবের। মিউট্যাণ্ট তৈরি করব যে, প্রোটোপ্লাজম কোথায়? জীবদেহ গড়বার সেই আধা-তরল মূল উপাদান? নিজে তৈরি করে নেওয়া, তাতে সময়ও লাগে, হাঙ্গামাও ঢের।"

"তাই খদ্দেরের দেহ থেকে—" বলতে যায় জেনসেন।

"ঠিক তাই"—ওর কথা শেষ করতে দেয় না বামন—"কিন্তু তাতে ত লোকসান কিছু নেই খদ্দেরের! সে টেরও পাবে না যে কিছু একটু বেরিয়ে গেল তার দেহ থেকে—কিন্তু তুমি যখন কুকুর ছানাটা কিনলেই না, তোমার কাছে আর সে-জিনিস চাইব কী করে?"

জেনসেন হাতঘড়ির দিকে তাকাল—"যাক, আমি যাচ্ছি। তোমার ব্যাপার স্যাপার বুঝতে কিছু বাকী নেই আমার। কাগজে লিখব আমি তোমার কথা—"

বামন ত ভয় পাওয়ার লক্ষণ কিছু দেখায় না!

অথচ জেনসেন যে আশা করে রয়েছে যে ভয়ে ওর হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে যাবে! ওটা না করে যদি চলে যেতে হয়, এক-রকমের হার মেনেই যাওয়া হল ওর কাছে।

মানুষের হামবড়াই থাকে অনেকরকম। জেনসেন-এরও এটা একরকমের হামবড়াই।

"সুখের বিষয়"—সেই হামবড়াইয়ের বশেই জেনসন বলতে থাকে আবার—"সুখের বিষয়, লিখবার কথা অনেক পেয়েছি তোমার সম্বন্ধে। মিউট্যাণ্ট বেচার নাম করে জোচ্চুরী চালানো—এই হল এক নম্বর! দুস্‌রা নম্বর—ঐ শিশিবোতল বোয়াম-গুলো—হ্যাঁ হে ওরা কীরকম কমিশন দেয় তোমায়?"

"ওরা? কারা?"—আকাশ থেকে পড়ে যেন বামন।

"মাদক বস্তুর বে-আইনী কারবারীরা"—কথাগুলো যেন একটা একটা করে জেনসেন বিঁধিয়ে দিতে চায় বামনের মগজে—"ওদের কাছ থেকেই আসে ত এসব মাল? দেশ-বিদেশের সরেস মদ, হাসিস, চরস, একশো এক রকম নিষিদ্ধ নেশার জিনিস? 'নতুন নতুন জাতের জানোয়ার'? স্রেফ সংকেতবাণী একটা। জানোয়ার মানে সেই সব চীজ, যা সেবনের ফলে মানুষ জানোয়ার বনে যায় তড়িৎ-ঘড়িৎ। বোঝে লোক, যে জান সন্ধান।"

"ওসব পাত্রে ত ওষুধপত্র আমার! মিউট্যাণ্ট বানানোর কাজে যা দরকার হয় হামেসাই—"

"বুঝেছি হে বুঝেছি, আর কথা বাড়াও কেন? কী রকম দামে বিক্রি কর হে এসব?"—যে বোতলটার গন্ধ জেনসেন আগেই শুঁকে রেখেছে, সেইটের দিকেই আঙ্গুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"এই এটার কী দাম?"

বামন বোতলটা তুলে নিল তাক থেকে, জেনসেন-এর হাতে দিয়ে বলল—"এর দাম তোমায় দিতে হবে না, তবে খালি বোতলটা আমার ফেরত চাই—"

জেনসেন আবারও ছিপি খুলল, আবারও শুঁকল ভিতরের জিনিসটা। তারপর আঙ্গুলের ডগায় একটুখানি তুলে নিয়ে চুষে দেখল আঙ্গুলটা। দেখতে দেখতে মুখে চোখে ফুটে উঠল তার অনির্বচনীয় আনন্দ।

"ওহে, সব কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি আমি, নিষিদ্ধ নেশার কথা-টথা যা যা বলেছি, সব—সব।" আর একবার আঙ্গুল ভেজাল, আর একবার চুষল—"নিষিদ্ধ হোক, যাই হোক, মদ বানাতে জানে বটে ওরা। আমি তোমার বাঁধা খদ্দের হয়ে যাব হে, কাল থেকে রোজ হাজির পাবে আমায় এই সময়।"

এবারে আর আঙ্গুল চোষা নয়, বোতল মুখে তুলে লম্বা এক চুমুক। জিনিসটা গলা দিয়ে নামছে, যেন মশাল শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে উদরের পথ বেয়ে।

"বাপ্‌স্‌!"—হাঁফ ছেড়ে নিয়ে বোতলটার দিকে অবিমিশ্র শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকিয়ে রইল জেনসেন। একমাত্র আপসোস—মালটা পরিমাণে কম, সিকি পাইটও নয়। আপসোস!

আর এক চুমুক! "জীতা রহো নিষিদ্ধ মালের ব্যাপারীরা।"

বামনটাও আবার কী বলছে এসময়?

বলছে—"একটা কথা মনে রেখো হে! আমার সঙ্গে ব্যবহার যা করেছ তুমি, রীতিমত অভদ্র।"

বোকার মত হাসল জেনসেন সেকথা শুনে। হাসা ছাড়া আর করবেই বা কী? ব্যবহার? তখন কি আর জেনসেন জানত যে নতুন জাতের জানোয়ার বলতে যা বোঝায়, তা হল—?

—"এর দাম তোমাকে দিতে হবে না।"

[পৃষ্ঠা ৫৫৪

বোকার মত দাঁত বার করে হাসল জেনসেন, তারপরই মাথাটা পিছনে হেলিয়ে, হাঁ করে বোতলটার সমস্ত মাল উজাড় করে গলার ভিতর ঢেলে দিল ও।

এ কী? বোমা ফাটছে না কি পেটের ভিতর? দোকানের দেয়ালগুলো যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল দৃষ্টির বাইরে, তারপরই আবার হুড়মুড় করে ধেয়ে এল ওকে চারদিক থেকে চেপে ধরবার জন্য। পাঁচ সেকেণ্ডের বেশী নয়। তার ভিতরই তার দুই পা থেকে সব শক্তি যেন গলে বেরিয়ে গেল একদম। এতক্ষণ টলছিল, এইবার সে সমুখের দিকে কুঁজো হল, তারপরই মুখটা গিয়ে থুবড়ে পড়ল মেজেতে।

কত যুগ যেন কেটে গেল তারপর। দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ, ধোঁয়াটে, আধা-ঘুমে আচ্ছন্ন, আড়ষ্ট। চাপা আওয়াজ মাঝে মাঝে কানে আসে যেন—গুমা গুম গুম। সে ভাবটা কেটে গেল ক্রমশঃ। জেনসেন যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠছে আস্তে আস্তে।

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে রয়েছে জেনসেন, যেমন করে কুকুর শেয়াল থাকে। মাথা ঘুরছে, মগজে ধরাও পড়ছে না স্পষ্ট কোন ধারণা। মাথার তালুতে কেউ যেন মুগুর বসিয়ে দিয়েছিল এক ঘা। বোধহয় সেই তর্ক-বিতর্কের ফলে। বোধহয় সেই অপয়া বামনটাই। তার শেষ কথাগুলো মনে পড়ে। সব কিছু ধোঁয়াটে হলেও সেই কথা কয়টা জ্বলজ্বলে হয়ে ফুটে রয়েছে মগজে—"ব্যবহার যা করেছ, রীতিমত অভদ্র।"

অভদ্র? দাঁড়াও বাপধন! অভদ্রতা আর কতটুকু দেখেছ তুমি? একটু চাঙ্গা হয়ে উঠতে দাও আমায়। মাথার এই ঘোরঘোর ভাবটা কাটুক। তোমার হাত, পা, নাক, কান ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরোগুলো দেশের চার কোণে ছড়িয়ে দিয়ে আসব।

চোখে কিন্তু কিছুই ঠাহর হয় না স্পষ্ট। দূরের জিনিস ত একদম না। নাক কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে চমৎকার। কত রকম গন্ধই যে এক সাথে টের পাচ্ছে জেনসেন।

পায়ের নীচে এই যে মেজেটা, যেমন মসৃণ, তেমনি ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা যেন বরফ। কী হতে পারে? কাচ? এত লম্বা চওড়া? এমন মোটা?

জিনিসটা কাচই কিনা, ভাল করে দেখবার জন্য নীচের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল জেনসেন। কাচই বোধহয়, তা নইলে মেজেতে তার ছায়া পড়ে কেন? তার ছায়া? ধুত্তোর! তার ছায়া ও-রকম কেন হবে? এ যে একটা খুদে চতুষ্পাদের ছায়া। এ ছায়া হতেই পারে না জেনসেন-এর ছায়া। নিশ্চয়ই না।

নিশ্চিতকে সুনিশ্চিত করবার জন্য জেনসেন মাথা নাড়ল জোরে জোরে। কী সর্বনাশ! ছায়াটাও মাথা নাড়ে যে! একটা সন্দেহ! একটা আতঙ্ক! মর্মভেদী হাহাকার একটা! কিন্তু সে হাহাকার কণ্ঠ দিয়ে ত বেরুলো না জেনসেন-এর! যা বেরুলো, তা একটা ক্ষীণ ঘড়ঘড় আওয়াজ মাত্র।

ছায়াটার রং ফিকে নীল। লম্বায়—এই ধর ইঞ্চি সতেরোর মত, কুৎসিত নাকটার উপরে শিং একটা আবার।*

* ই. এফ. রাসেল-এর "দিস্ ওয়ান'স অন মি" অবলম্বনে।

—————

বিশেষ সংবাদ

শ্রাবণ সংখ্যার সুব্রত গল্প প্রতিযোগিতায় যাঁহাকে প্রথম বলে ঘোষণা করা হইয়াছিল সে লেখাটি নকল প্রমাণিত হওয়ায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তকে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হইল এর দ্বিতীয় পুরস্কারের অধিকারিণী হইলেন কুমারী করবী বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিকানা ৮৮সি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৪।

এক দিনের রাজা

নীহারেন্দু দাস

বিলেতে আনউইন টপার নামে এক লোক বাস করত। লোকটা ছেলেবেলা থেকেই একটু উদ্ভট ধরনের। যতসব উর্বর পরিকল্পনা তার মাথায় ঘুরত। সে সব পরিকল্পনার রূপায়ণ ছিল অবাস্তব। একটা পরিকল্পনা তার মাথায় এসেছিল যার জন্যে সে প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে নিজের ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

আমি আনউইন টপার, একজন সু-নাগরিক। বৃটেনের মঙ্গলের জন্যে আমি নানারকম পরিকল্পনা করেছি। যেগুলির রূপায়ণে ব্রিটিশ জাতি আবার সর্বশ্রেষ্ঠ ও ধনশালী দেশে পরিণত হবে। ব্রিটেনের মঙ্গলের জন্যে আপনি দয়া করে আমাকে ২৪ ঘণ্টার একনায়ক পদে বহাল করে বাধিত করুন। এই চিঠির প্রতিলিপি মহামান্য রানীর কাছে পাঠান হল।

আনউইন টপার।

তখন যুদ্ধের সময়। তাছাড়া যে সময়ই হোক না, এ ধরনের চিঠি কেরানীরা কমলই দেয় না। মহারানী ও প্রধানমন্ত্রীর অফিসের কেরানীরা চিঠি পড়ে আশে-পাশের বন্ধুবান্ধবকে দেখিয়ে খুব হাসাহাসি করে বাজে কাগজের বাক্সে সেটা ফেলে দেয়। কেরানীরা ভাবে ইংল্যাণ্ডে পাগলের সংখ্যা বাড়ছে।

কিন্তু আনউইন টপার মোটেই পাগল ছিল না। সে বিশ বছর বয়সেই অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট হয়। কিন্তু শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে সে সারাদিনে মাত্র এক ঘণ্টা পড়ত। বাকী সময় প্ল্যান ভাঁজাতে ব্যয় করত। প্ল্যান ভাঁজা ছিল তার নেশা। সমস্ত

প্ল্যানই ছিল বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে। কেমন করে মানুষের ভাল হবে, কেমন করে যুদ্ধ আর কোনদিন হবে না, কেমন করে ব্রিটিশ আবার পৃথিবীর সেরা জাতি হবে ইত্যাদি।

তার ধারণা ব্রিটিশরা বেশ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। তারা এখন তৃতীয় শক্তিতে নেমে এসেছে। পরে যে কি অবস্থা হবে তা সবাই আন্দাজ করতে পারে। অতএব প্রতি তিন মাস অন্তর প্রধানমন্ত্রী ও মহারাণীর দপ্তরে একই চিঠির অনুলিপি যেতে লাগল।

এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরে প্রধানমন্ত্রী বদলাল, মহারানী বদলাল, কেরানীও কত এল গেল, কিন্তু আনউইন বদলাল না। সে তিন মাস অন্তর একই চিঠি লিখে চলল। কারণ সে জানে সুযোগ একদিন মিলবেই।

দীর্ঘ পঁচিশ বছরে কথাটা ক্রমে হেডক্লার্ক, থার্ড সেক্রেটারী, সেকেণ্ড সেক্রেটারী, ফার্স্ট সেক্রেটারী এমন কি মহারানী ও প্রধানমন্ত্রীর কানে উঠল।

একদিন এক ভোজসভায় মহারানী প্রধানমন্ত্রীকে বলল, "ব্রিটেনেও একনায়কত্বের জন্যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সে খবর রাখেন কি?"

প্রধানমন্ত্রী তো তাজ্জব। কোন রকম ষড়যন্ত্রের কথা তো তিনি জানেন না। মহারানী ব্যাপারটা বলতে প্রধানমন্ত্রী হেসে ওঠেন। নিমন্ত্রিত অতিথিরা কেউ বুঝতে পারে না প্রধানমন্ত্রীর হাসির কারণ কি। মহারানী ও প্রধানমন্ত্রী হাসতে হাসতে কানে কানে কি সব কথাবার্তা বলেন।

পরদিন আনউইন টপারের কি আনন্দ। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে তার ডাক এসেছে। ভাল জামা-কাপড় পরে, তাঁর পাঠান রোলসরয়েস-এ চড়ে প্রাসাদে উপস্থিত হল। তার জীবনের স্মরণীয় দিন আজ। মহারানী ও প্রধানমন্ত্রী তাকে আজ সন্ধ্যে ৬টা থেকে কাল সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত একনায়ক পদে বরণ করলেন। ব্রিটেনের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে দলিল তৈরী হল এবং তার হাতে সেটা সম্মান সহকারে প্রধানমন্ত্রী দিলেন।

সন্ধ্যে ৬টা বেজে পাঁচ মিনিটে আনউইন নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীর প্রধান ও মন্ত্রীবর্গ নিয়ে বসল। সবার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তিন বাহিনীর প্রধান ও সমর মন্ত্রী ছাড়া সবাইকে চলে যেতে বলল সে। একে একে সবাই চলে গেল সেখান থেকে। আনউইন বিমান বাহিনীর প্রধানকে বলল, "এক্ষুণি বিমান বাহিনীকে প্রস্তুত হতে বলুন, বারটার মধ্যে ফ্রান্স দখল করা চাই।"

তারপর নৌ ও স্থল বাহিনীর প্রধানদের বলল, "আপনারাও তৈরী থাকুন, রাত্রি বারটায় যেন শুনতে পাই ফ্রান্স দখল হয়ে গেছে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "বেগতিক দেখলে দশ বারটা শহর অ্যাটম বোমা মেরে উড়িয়ে দেবেন।"

সমর মন্ত্রীর চোখ কপালে উঠে গেছে কথা শুনে। সে বলে, "বলেন কি স্যার? একটু ভেবে দেখুন, কত বড় সাংঘাতিক—"

আনউইন চেঁচিয়ে ওঠে, "শাট আপ, ব্রিটেনের একনায়কের বিপক্ষতা কেউ করতে পাবে না। তা করলে তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, এই আমার আদেশ।"

সমর মন্ত্রী চুপ করে যায়। তিন অধিনায়ক স্যালুট দিয়ে চলে যায় নিজ কর্তব্যে। আনউইন যুদ্ধযাত্রার লিখিত অর্ডার সমর মন্ত্রীর হাতে দেয়। ইতিমধ্যে নানা কাজে নানা মন্ত্রীরা ও অমাত্যবর্গ তার কাছে আসে। নানা কাগজে সই করতে করতে নিজের প্ল্যান ভাঁজতে থাকে।

"শাট আপ, ব্রিটেনের একনায়কের বিপক্ষতা কেউ করতে পাবে না।"

আনউইন উপস্থিত সবাইকে বলে, "ফ্রান্সটা আমাদের দখলে চাই। ব্রিটেনের সব থেকে কাছের শক্তিশালী দেশটা না দখল করলে ব্রিটেনেরই বিপদ। এর ফলে ব্রিটিশদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। ফ্রান্স যদি ছ ঘণ্টায় খতম হয় তাহলে জার্মানি চার ঘণ্টা ও রাশিয়া আট ঘণ্টা। আমার মনে হয় আমাদের সুপারসনিক অ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা বাহিনী আরও কম সময়ে কাজ সমাধা করবে। এ ছাড়া মেন ল্যাণ্ড থেকে রকেটে করে আক্রমণ আরও সুবিধেজনক। এই তিনটি দেশকে আণবিক যুদ্ধে হারালে গোটা ইওরোপ আমাদের পদতলে লুটিয়ে পড়বে। পরে অবশ্য আরও কয়েকটা শক্তিকে বিনাশ করতে হবে। এসব ব্যাপারে আমেরিকাকে হাত করতে বেশী সময় লাগবে না আশা করছি।"

আরও কত শত কথা অনর্গল বলতে থাকে আনউইন। সঙ্গীরা কেউ কেউ মোসাহেবী করতে থাকে।

কেউ বলে, "আপনার মাথায় এত বুদ্ধি! আমাদের প্রধানমন্ত্রী আর পালামেণ্টের মেম্বারগুলো নিরেট বোকা।"

অন্য কেউ বলে, "আপনার প্রতিভা অসামান্য। আপনার মত প্রতিভাধর ব্যক্তি এর আগে জন্মায় নি।"

নানা স্তোকবাক্যে সে মনে মনে খুব আনন্দিত হয়। কিন্তু বাইরে গাম্ভীর্য বজায় রাখে। সে যে ব্রিটেনের একনায়ক। আনউইন ব্রিটিশদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় আইনের পর আইন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে তৈরি করে যেতে লাগল। অটোমেটিক কম্প্যুটার সেগুলোর লিখিত রূপ দিতে লাগল। একের পর এক লোক সেই লিখিত আদেশ নিয়ে যেতে লাগল। আনউইন অনর্গল বলে চলেছে।

রাত্রি পৌনে বারটায় খবর এল ফ্রান্স অতর্কিত আক্রমণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। কয়েকটা অ্যাটম বোমা ব্যবহার করতে হয়েছে।

আনউইন আনন্দে ফেটে পড়ে, "জানি ব্রিটিশদের ছ ঘণ্টাও লাগবে না ফ্রান্স জয় করতে। ব্রিটিশ আণবিক বাহিনী অজেয়। হ্যাঁ, বিকিরণ থেকে দ্বীপপুঞ্জকে বাঁচাবার জন্যে আধুনিক রেমার্ক পদ্ধতি কি নেওয়া হয়েছে ?"

একজন বলে, "হ্যাঁ স্যার, যুদ্ধের আগেই নেওয়া হয়েছে।"

"ভেরি গুড !"—সে বলে।

কাঁটায় কাঁটায় বারটার সময় তিন অধিনায়ক স্যালুট করে।

আনউইন আনন্দে তাদের জড়িয়ে ধরে।

সে বলে, "স্থল ও নৌবাহিনী ব্রিটেন প্রতিরক্ষায় থাকুক, আপনি হাজারটা সুপারসনিক নিয়ে আক্রমণ করুন জার্মানি আর রাশিয়াকে। এই দুটো শক্তি ঘায়েল করুন। মনে রাখবেন এটা আণবিক যুদ্ধ। ফ্রান্সের ক্ষেত্রে যে দয়ামায়া করেছেন তা করবেন না, হ্যাঁ, যাতায়াত ছ ঘণ্টা আর দেশ দুটো জয় করতে বার ঘণ্টা। আশা করি তার আগে সুখবর পাব।"

—"আমিও তাই আশা করি স্যার।" বিমান বাহিনীর প্রধান বলে। সে স্যালুট দিয়ে চলে যায়।

আনউইন পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা অনর্গল বলে চলেছে। একটা শেষ হচ্ছে আরেকটা। তার আজ্ঞাবহ লোক আসছে যাচ্ছে। এইভাবে ক্রমাগত কথা বলায় তার জিভ ও গলা শুকিয়ে গেছে। সেদিকে তার খেয়াল নেই, ঘুম বা খাওয়ার কথা মনে নেই। ভোর পাঁচটার সময় কে একজন বুদ্ধি করে তার সামনে এক গ্লাস পানীয় রেখে যায়। সে এক চুমুকে পানীয়টা শেষ করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। চাকরেরা ঘরে শোওয়ার বন্দোবস্ত করে তাকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেয়। পাঁচজন সশস্ত্র প্রহরী তাকে গার্ড দিতে থাকে। অন্যান্য সবাই ঘুমতে চলে যায়।

পরদিন বেলা প্রায় দুটোর সময় আনউইনের ঘুম ভাঙে. তার মুখহাত ধোওয়ার জল তৈরি ছিল। মুখহাত ধুয়ে দেখে. তার সঙ্গীরা প্রায় সবাই উপস্থিত। সে মনে মনে লজ্জিত হয়ে চেয়ারে বসে বসেই সে প্রচণ্ড ক্ষিদে অনুভব করে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে খাবার এসে গেল। কাউকে কিছু বলতে হল না। আনউইন মনে মনে প্রসন্ন হল।

খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, "খবর সব ভাল তো?"

একজন উত্তর দিল, "হাঁ স্যার, জার্মানী বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছে।"

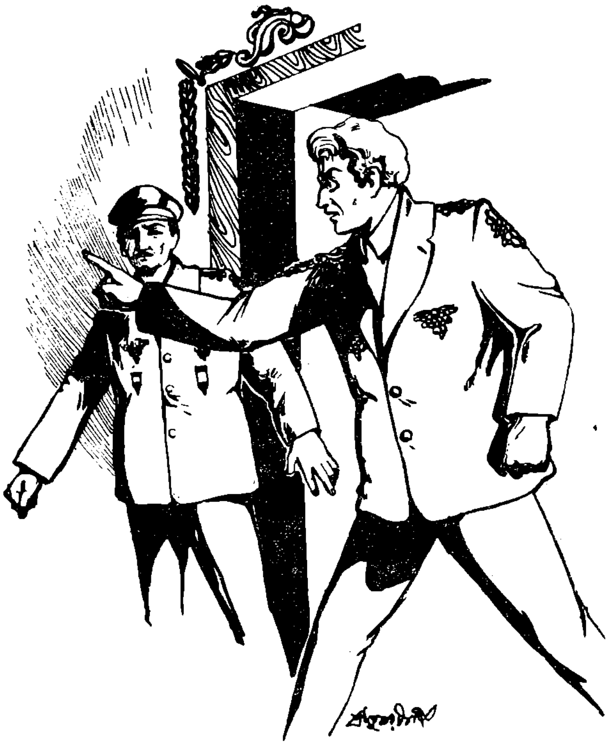

—"কী এত বড় কথা। প্রহরী, বন্দী কর একে।" [পৃষ্ঠা ৫৬২

আনউইন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আবার শুরু হয় তার বাক্যস্রোত। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা। তার খেয়াল নেই সে মাত্র ২৪ ঘণ্টার এক নায়ক।

কাঁটায় কাঁটায় ৫-৪৫ মিনিটে বিমান বাহিনীর প্রধান ঘরে ঢুকে বলে, "কাজ শেষ হয়।"

আনউইন প্রধানের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বক্তৃতা দিতে থাকে ওসব দেশ কেমনভাবে শাসন করতে হবে। বিকিরণ থেকে কেমনভাবে মানুষকে বাঁচান হবে। এমন সময় স্থল ও নৌবাহিনীর প্রধান ঘরে ঢুকল। চোখে মুখে তাদের প্রচণ্ড আতঙ্ক।

একজন বলে, "সর্বনাশ হয়েছে স্যার, ব্রিটেনের দশটা শহরে অ্যাটম বোমা পড়েছে। শত্রু আমাদের দেশকে শ্মশান করে দিয়েছে। শুধু মাত্র লণ্ডনকে জিইয়ে রেখেছে। লণ্ডনের পথে ঘাটে বিচিত্র দর্শন অভেদ্য যন্ত্র সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা যদি বশ্যতা স্বীকার না করি তাহলে লণ্ডনও একই দশাপ্রাপ্ত হবে।"

স্থল বাহিনীর প্রধান কেঁদে ফেলে।

ঘরের সবারই মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে। দু একজন এ খবর শুনে অজ্ঞান হয়ে যায়। আনউইন মিনিট দুই তিন বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলে।

তারপর প্রচণ্ড রাগে, ক্ষোভে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, "কি করে তারা ঢুকল এখানে? প্রতিরক্ষার তো কোন ত্রুটি করিনি? ব্রিটিশ সৈন্যরা কি ঘাস খেয়ে বড় হয়েছে? তারা একটা যন্ত্রকেও ঘায়েল করতে পারল না…?"

তার কথা থামিয়ে সমর মন্ত্রী জোর গলায় বলে, "না স্যার, আপনিই ঘাস খেয়ে বড় হয়েছেন।"

—"কী এত বড় কথা। প্রহরী, বন্দী কর একে।"

তার কথাগুলো কেউ শুনতে পেল কি না বলা যায় না। সমর মন্ত্রীর কথা শুনেই সঙ্গীরা অট্টহাসিতে ঘর কাঁপিয়ে তোলে। টপার কাণ্ডজ্ঞানহীন হওয়ার আগেই তার চোখের সামনে দুটো বাঁ হাত এগিয়ে আসে। হাতে কবজির ঘড়িতে ছটা বেজে দশ সেকেণ্ড। আনউইনের মাথা ঘুলিয়ে যায়।

সে প্রধানমন্ত্রী এবং মহারানীর পা জড়িয়ে ধরে ছোট ছেলের মত কেঁদে ওঠে, "ব্রিটেনকে বাঁচান আপনারা। ওঃ, কি ভুলই না করেছি। আমার সব দেশবাসী যে শেষ হয়ে গেল। কার জন্যে তাহলে আমার বিজয় অভিযান হল।"

প্রধানমন্ত্রী ও মহারানী মুচকি মুচকি হাসতে থাকে। এবার কয়েকশো লোকের অট্টহাসির রোল ওঠে। আনউইন মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। সে উঠে বসে দেখে যে সে এক বড় থিয়েটার মঞ্চে রয়েছে। সামনের আসনে বহু দর্শক হাসছে। দর্শকেরা সবাই ব্রিটেনের গণ্যমান্য লর্ড, ডিউক ও অমাত্যবর্গ।

প্রধানমন্ত্রী নাটকের শেষে বলতে লাগলেন আনউইনের পঁচিশ বছরের চিঠি লেখার কথা। মতলব খাটিয়ে কেমনভাবে থিয়েটার দেখান এবং আনউইনের মনের ইচ্ছা পূরণের ব্যবস্থা করা হল, তা বলায় থিয়েটার হলে আবার হাসির রোল উঠল।

থিয়েটার মঞ্চ এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছিল যে দর্শকদের অভিনেতারা দেখতে পাবে না। অভিনেতারা সবাই নিজের নিজের ভূমিকাতেই অভিনয় করেছে। অর্থাৎ সমর মন্ত্রী বা তিন বাহিনীর প্রধান সবাই নিজের রোলে অভিনয় করেছে। এদিকে আনউইন ভেবেছে সে সত্যিকারের একনায়ক হয়ে গেছে। দর্শকরা জানে অভিনয় হচ্ছে। আর অভিনেতারা জানে একটা বিরাট রসিকতা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ও মহারানীর খেয়ালে।

আনউইনকে ভোরের দিকে পানীয়ের মধ্যে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হয়। তার ঘুম ভাঙার আগেই যে যার ঘুম ও বিশ্রাম সেরে নিজ নিজ আসনে বসে গিয়েছিল।

আনউইনের মুখে কথা নেই। সে এখন উপহাসাস্পদ। যেন পরাজিত হিটলার বা মামলাহারা শাইলক। সে ভাবছে ধরণী দ্বিধা হও।

মহারানী দর্শকদের বলল, "এই অভিনয়ের মধ্যে বোঝা গেল যে আনউইন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। সে ব্রিটিশদের মঙ্গল চায়। উগ্র দেশপ্রেম ও অন্ধ জাতিগত স্বার্থ রক্ষার ফল যে কি ভয়াবহতা এই সামান্য ঘটনা থেকে বোঝা গেল। আনউইন একজন দেশপ্রেমিক বলে আমার এই উপহার তাকে দেওয়া হল।"

মহারানী দেশপ্রেমিকের সোনার ব্যাজ আনউইনের বুকে এঁটে দিল। আনউইনের মুখে হাসি ফুটল। থিয়েটার হল হাততালির শব্দে মুখর হল।

বল দেখি—

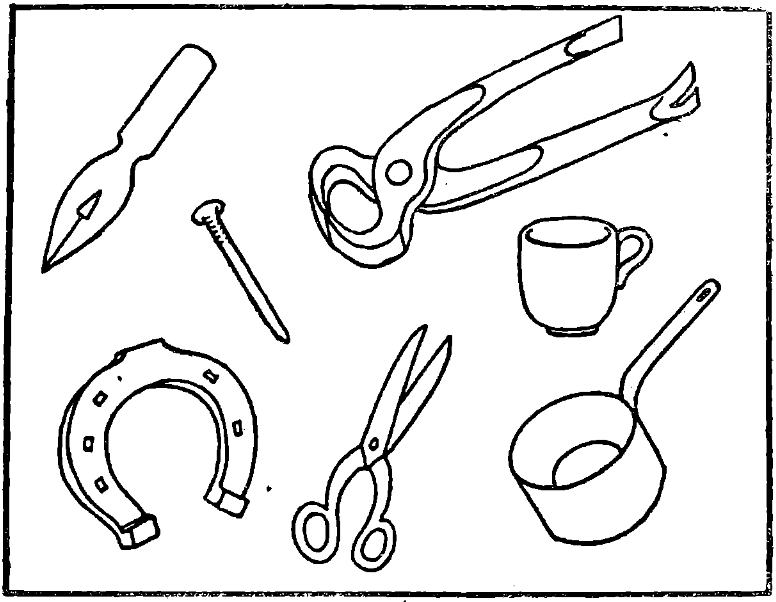

এবার তোমার বুদ্ধি দেখি। উপরের ছবি দেখে বল এদের মধ্যে কোন্ জিনিসটা দল থেকে আলাদা হল। না পারলে ৫৮২ পৃষ্ঠায় দেখ।

সোনা ও রূপা　ছবিতে গল্প　(পূর্বানুবৃত্তি)　দিলীপ দাস

তারপর পাশে পড়ে থাকা সোনা ভর্তি বস্তাটা কাঁধে তুলে নিল বেঁটে বুড়োটা।
বোকা মেয়ে, তোরা কাঁচকলা খা।
বাড়িতে ফিরে আসতেই বেঁটে বুড়োর সমস্ত ঘটনাটা ভুলে গেলো ওরা। পরদিন সকালে—
সোনা-রূপা, তোরা আজ কিছু মাছ ধরে নিয়ে আসিস তো
আচ্ছা, মা

(চলবে)

সম্রাটের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল রশির এক-দিকের প্রান্তটি।

জাদুকর বৈজ্ঞানি-কের গল্প

শ্রীবিশ্বনাথ দাস

আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগেকার কথা বলছি।

গ্রীক নগরী সারাকিউসের সমুদ্র-তীরে জমায়েত হয়েছে বিশাল এক জনতা। ভুঁইফোড় এক ছোকরা, যে আবার নিজেকে বৈজ্ঞানিক বলে দাবি করে, নাকি প্রমাণ করবে, মাত্র একজন মানুষের কবজির জোরে কয়েক হাজার টন ওজনের বিশাল একটি মালবাহী জাহাজ শূন্যে ওঠানো সম্ভব! পাগল আর কাকে বলে!

ছোকরাটি কেমন নাস্তানাবুদ আর হেনস্থা হয় সম্রাটের সামনে, তাই দেখতে লোকে ভিড় করেছে দলে দলে।

চারপাশের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আর উপহাসের গুঞ্জন উপেক্ষা করে ছোকরাটি গ্রীক সম্রাট হিয়ারোঁকে আহ্বান জানালেন। কৌতূহলী জনতা উৎসুক হয়ে উঠল। সম্রাটের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল রশির একদিকের প্রান্তটি। কী সব কলকবজার মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে এনে রশিটির অপর প্রান্ত বাঁধা রয়েছে অদূরে সমুদ্রে ভাসমান জাহাজটির সঙ্গে।

সম্রাট রশিটিকে আলতো টান দিলেন। জাহাজটির কোন ভাবান্তরই চোখে পড়ল না—যেমন ছিল, নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল যথাস্থানে।

মজা পেয়ে বিদ্রূপে ফেটে পড়ল জনতা।

—বাঃ, সত্যিই তো জাহাজটা অনেকখানি উঠে গেছে শূন্যে!

—দাঁড়া, দাঁড়া। উঠবে বৈকি! মন্ত্রটা এখনও ঠিকমত পড়া হয়নি কিনা!

—সাবাস, ছোকরা!

একটুও না দমে ছোকরাটি সম্রাটকে অনুরোধ করলেন—আবার টানুন।

সম্রাট আর একবার চেষ্টা করলেন। কয়েক হাজার চোখ আবার পড়ল গিয়ে জাহাজটির ওপর।

ওকি! জাহাজের পিছনের দিকটা একটু দুলে উঠল না? কী আশ্চর্য, সবাই ভালো করে চোখ রগড়ে তাকাতে না তাকাতেই দেখা গেল, বিশালকায় জাহাজটি সত্যি সত্যিই অনেকখানি উঠে গিয়েছে শূন্যে!

বিদ্রূপের গুঞ্জন মুহূর্তে পর্যবসিত হল সোচ্চার জয়ধ্বনিতে। সম্রাট আনন্দের আতিশয্যে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর একান্ত স্নেহভাজন এই তরুণ বৈজ্ঞানিককে।

সেদিনের এই ভুঁইফোড় ছোকরাটি কে জান? ইনি হলেন বিশ্ববন্দিত গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কেমিদিস। কপি কল কিংবা ক্রেনের সাহায্যে ভারী ভারী জিনিস কীভাবে সহজে অল্প আয়াসে ওপরে ওঠানো যায়, আজ তোমরা সকলেই তা জান। কিন্তু আজ থেকে দুহাজার বছর আগে কপিকল কিংবা ক্রেনের ব্যবহার কেউ জানত না। তখনকার দিনে বিরাট সব প্রাসাদ আর মিনার তৈরি করার সময় ভারী ভারী পাথর, কি অন্যান্য মালমসলা সব মাথায় বয়ে ওপরে তোলা হত। আর্কেমিদিসই প্রথম কপিকল আবিষ্কার করেন। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। সেদিন জাহাজ শূন্যে ওঠানোর 'ম্যাজিকটি' দেখাতে তিনি কপিকল ব্যবহার করেছিলেন। সেদিন আর্কেমিদিস বড়াই করে বলেছিলেন—পৃথিবীর বাইরে যদি পা রাখার একটু জায়গা জুটত, তাহলে কবজির জোরে এই পৃথিবীটাকেই শূন্যে ওঠাতে পারতাম।

খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৭ অব্দে আর্কেমিদিস জন্মগ্রহণ করেছিলেন গ্রীস দেশের অন্তর্গত সিসিলি দ্বীপের সারাকিউস নগরে। তাঁর পিতা ফিডিয়াস ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ্। আর্কেমিদিসের বরাবরের ঝোঁক ছিল দর্শন আর গণিতের দিকে, কিন্তু ভাগ্যচক্রে তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময়ই ব্যয় করতে হয়েছে নানান ধরনের সব যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবনে। অবশ্য গণিত শাস্ত্রেও তাঁর অবদান সামান্য নয়।

সারাকিউসের সম্রাট হিয়ারোঁর সঙ্গে আর্কেমিদিসের কী যেন একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। এই সম্রাটই ছিলেন তাঁর সব থেকে বড় পৃষ্ঠপোষক আর গুণগ্রাহী। এঁরই ইচ্ছানুসারে আর্কেমিদিস সারাজীবনে প্রায় চল্লিশটি যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। এগুলির অধিকাংশই উদ্ভাবিত এবং ব্যবহৃত হয়েছিল গ্রীকদের চিরশত্রু রোমানদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধের প্রয়োজনে।

আর্কেমিদিসের এই সব আবিষ্কার সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর সব গল্প প্রচলিত আছে। একবার হল কী, সম্রাট হিঁয়ারো একজন কারিগরকে তৈরি করতে দিলেন একটি সোনার

মুকুট। স্বর্ণকার সুন্দর কারুকার্য করা সোনার মুকুটটি তৈরি করে নিয়ে এলে, সেটি হাতে নিয়ে সম্রাটের কেমন যেন সন্দেহ হল। স্বর্ণকার বোধহয় সোনায় কিছুটা খাদ মিশিয়েছে। তরুণ আর্কেমিদিসের ওপর অতঃপর ভার পড়ল, মুকুটটি না ভেঙে সম্রাটের সন্দেহের সত্যাসত্য যাচাই করার। অনেক চিন্তা-ভাবনা, পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও আর্কেমিদিস সমস্যাটির কোন কিনারা করতে পারলেন না। অবশেষে একদিন রাজপ্রাসাদের স্নানাগারে স্নান করার সময় তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, জলপূর্ণ চৌবাচ্চায় তাঁর শরীরটা ডোবানোর ফলে কিছুটা জল উপচে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেহটাও কিছুটা হালকা বোধ হল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় তাঁর বিদ্যুতের মতো চিন্তা খেলে গেল। তিনি চিৎকার করে উঠলেন ইউরেকা, ইউরেকা—অর্থাৎ পেয়েছি, পেয়েছি। তাঁর উলঙ্গ অবস্থার কথা বেমালুম বিস্মৃত হয়ে তিনি সেই অবস্থাতেই সারাকিউসের রাজপথ দিয়ে ছুটে এলেন নিজের বাড়িতে। বাড়ি পৌঁছেই মুকুটের সমান ওজনের একতাল সোনা ডোবালেন জলপূর্ণ একটি পাত্রে। সযত্নে মেপে নিলেন উপচে পড়া জলের পরিমাণ। অতঃপর পাত্রটি পুনরায় জলপূর্ণ করে তাতে এবার ডোবালেন মুকুটটি। এবারেও উপচে পড়া জলের পরিমাণটুকু মেপে তিনি দেখলেন, এই পরিমাণ আগের বারে উপচে পড়া জলের পরিমাণের সমান নয়। বৈজ্ঞানিক রায় দিলেনঃ মুকুটের সোনায় খাদ আছে। অসাধু কারিগরকে আগেই আটক করা হয়েছিল, এখন বাধ্য হয়ে সে সব কিছু কবুল করে মাথা পেতে নিল রাজদণ্ড।

এবং এই সঙ্গে আবিষ্কৃত হল পদার্থ-বিজ্ঞানের বিখ্যাত 'আর্কেমিদিসের নীতি'টি, যার বয়ান হচ্ছে—কোন বস্তুকে তরলে আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে ডোবানো হলে বস্তুটির ওজন আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা কমে যায় এবং এই কমের পরিমাণ, বস্তু যে আয়তনের তরল স্থানচ্যুত করে তার ওজনের সমান।

সম্রাট হিয়ারোঁর রাজত্বকালেই প্রায় ষাটটি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে রোম সেনাপতি মার্সেলাস অতর্কিতে সারাকিউস আক্রমণ করে বসল। প্রস্তুতিবিহীন সম্রাট বিপন্ন হয়ে আর্কেমিদিসের শরণাপন্ন হলেন। অদ্ভুত প্রতিভাধর এই বৈজ্ঞানিক দিনের পর দিন নানান ধরনের সব বিস্ময়কর কৌশল উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ করে সারাকিউসের সীমানা থেকে মার্সেলাসের নৌবহর দূরে ঠেকিয়ে রাখলেন পুরো তিনটি বছর। একবার বিরাট বিরাট ধাতব আয়না থেকে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত করে রোমানদের সমুদ্রবুকে ভেসে থাকা কয়েকটি যুদ্ধজাহাজে আগুন লাগিয়ে দিলেন আর্কেমিদিস। এই 'ভৌতিক' ব্যাপার দেখে অন্য জাহাজগুলির নাবিকেরা প্রাণভয়ে মাঝসমুদ্রে পালিয়ে গেল।

আর একবার রোমানদের কয়েকটি জাহাজ বিপজ্জনকভাবে কাছাকাছি এগিয়ে আসাতে

আর্কেমিদিসের আবিষ্কার করা শক্তিশালী চুম্বকলোহা দিয়ে সেগুলি আকর্ষণ করে, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল হিয়ারোঁর সৈন্যসামন্তরা।

আরও একবার মার্সেলাসের সৈন্যসামন্ত শহরের দেওয়ালে ভারী ভারী মই লাগিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করলে, আর্কেমিদিস বিরাটকায় সব শক্তিশালী চুম্বক আর ক্রেনের সাহায্যে সেগুলি ওপরে উঠিয়ে নিয়ে ভেঙ্গে চুরমার করার ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে বৈজ্ঞানিক জাদুকরের বুদ্ধির কাছে বার বার পরাস্ত হতে থাকল মার্সেলাস।

আর্কেমিদিস বালির ওপর কী সব আঁক-জোক করছিলেন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই যুদ্ধেই প্রাণ দিতে হল প্রতিভাধর এই বৈজ্ঞানিককে। সাময়িক সাফল্যের সূত্রে কিছুদিনের মধ্যেই গ্রীকসৈন্যদের আত্মতুষ্টি এসে যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ২১২ অব্দের সেই অভিশপ্ত রাত্রে উৎসবক্লান্ত প্রহরীদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে দেওয়াল বেয়ে রোমান সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করে অতর্কিত আক্রমণে গ্রীকদের পরাস্ত করল। বৈজ্ঞানিক জাদুকরকে প্রাণে না মেরে তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করার জন্য মার্সেলাসের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও চিনতে না পারার দরুন অখ্যাত এক সৈনিকের তরবারিতে আর্কেমিদিসের জীবনদীপ নির্বাপিত হল। শোনা যায়, ধরা পড়ার সময় আর্কেমিদিস বালির ওপর কী সব আঁক-জোক করছিলেন। সৈনিকের অভিপ্রায় শুনে বিজ্ঞান সাধক নাকি নির্লিপ্ত স্বরে বলেছিলেন—ঠিক আছে। তবে আগে আমাকে আমার আঁক-জোক শেষ করতে দাও।

আর্কেমিদিসের অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল কিনা শেষ পর্যন্ত জানা যায় নি। তোমরা বড় হয়ে এই জাদুকর বৈজ্ঞানিকের অত্যাশ্চর্য সব আবিষ্কারের কথা পড়বে।

———

প্রতীহার-সম্রাট বৎসরাজ

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

তা, চাকরিটা মিলেছে ভাল। কিংবদন্তীর সঙ্গে সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছে। ভগবান রামচন্দ্রের কুটিরদ্বারে চতুর্দশ বৎসর প্রতিহারী ছিলেন অনুজ লক্ষ্মণ। সেই লক্ষ্মণেরই বংশধর ত বৎসরাজ! রাষ্ট্রকূট সম্রাটের মহাপ্রতীহার পদে তাঁর নিয়োগ তাই বেমানান কিছু নয়।

তবু কেমন ভাল লাগছে না যেন। চাকরি? ওটা যেন পীড়া দেয় মনকে। ঠাকুর লক্ষ্মণ যে অগ্রজকে পাহারা দিতেন, সেটা প্রাণের টানে। বৎসরাজ কেন পাহারা দেবেন সম্রাট ধ্রুবকে? প্রাণের টান কোন তরফেই ত নেই! পরিচয়ও ছিল না দু'দিন আগে।

ছিলই না ত! অবন্তীবাসী বৎসরাজ চোখেও দেখেন নি মান্যক্ষেত্র কোনদিন। সেই মান্যক্ষেত্রে সম্রাট এখন কে, তা নিয়ে মাথাও ঘামান নি কখনো। হঠাৎই একদিন শুনলেন যে গ্রামপ্রান্তে শিবির পড়েছে একটা, ঢ্যাঁড়রা পিটিয়ে কে এক রাজপুরুষ আহ্বান করেছেন সব সমর্থ যুবক ও প্রৌঢ়দের, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য।

বৎসরাজও গিয়েছিলেন অন্য পাঁচজনের মত। কৌতূহলের বশেই। তা নইলে, রাজপুরুষের কী ধার ধারেন তিনি? পৈতৃক জমিজমা তাঁর নেই যে এই রাজপুরুষ তাঁর উপরে খাজনা ধার্য করবেন, বা তা কেড়ে নেবেন। সম্পদের মধ্যে একটা ঘোড়া আর একখানা তরোয়াল। আর যা কিছু ছিল, সব ফেলে এসেছেন ঘৃণা ভরে। মুসলমানের পদানত হয়ে রাজ্যসুখ ভোগকে পাপ বিবেচনা করেন বলে।

ছিল, অনেক কিছুই ছিল। একখানা স্বর্ণসিংহাসন ছিল, বিস্তীর্ণ দেশের নগরে নগরে প্রাসাদ ছিল রমণীয়, দাস-দাসী, ধনৈশ্বর্য, সম্ভোগ বিলাস, অভাব ছিল না কিছুরই। বজায় থাকতে পারত এখনো, যদি শুধু সুলতান কামরুজ্জমানকে একটা কুর্নিশ করতে পারতেন নিজের অধিরাজ বলে। পারেন নি। রুচিতে বেধেছে। বংশ-মর্যাদায় আঘাত লেগেছে। সূর্যবংশধর বৎসরাজ কুর্নিশ করবে কাকে আবার ?

প্রপিতামহ নাগভাটের বাহুবলে অর্জিত মরুরাজ্য। তিনি তাই ঘৃণাভরে বর্জন করে এসেছেন। অবন্তীর এই অখ্যাত পল্লীর প্রান্তে কুঁড়ে বেঁধেছেন নিজের হাতে। বনে আছে গাছ, কেটে আনলেই হল। মাঠে আছে খড়, তাও কেটে আনলেই হল। সে সবের মালিক জনসাধারণই। বিদেশী মানুষ ঘর বাঁধবার জন্য দুটো গাছ বা দশ বোঝা খড় যদি কাটে, গ্রামবাসীরা আপত্তি ত করবেই না, বরং সাহায্য করবে যথাসম্ভব, গায়ে-গতরে খেটে।

ছয় হাত লম্বা কুঁড়ে বেঁধে মরুরাজবংশধর আরামেই ছিল একরকম, এমন সময় শোনা গেল কোথাকার কোন রাজপুরুষের ঢ্যাঁডরা।

রাজপুরুষ একা আসেন নি, সঙ্গে ভল্লধারী সৈনিক আছে শো খানিক। তারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে শিবির ঘিরে। বৎসরাজ তাদের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েছিলেন, তাইতেই সারা অঙ্গ রি-রি করে উঠেছিল তাঁর। এরা আবার সৈনিক নাকি ? সোজা হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত জানে না যারা ?

কিন্তু রাজপুরুষের বক্তৃতাটা শুনতে ত হয় !

উনি বলছেন—রাষ্ট্রকূট সম্রাট ধ্রুবর প্রতিনিধি উনি। কাদের সঙ্গে কী যেন একটা সন্ধি হয়েছে কোথায় যেন। সেই সন্ধির সূত্রে উজ্জয়িনী নগর সমেত এই বিস্তীর্ণ অবন্তীদেশ এই সম্প্রতিই অধিকারভুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রকূটদের।

উনি আশ্বাস দিচ্ছেন—রাজা বদলের দরুন প্রজাসাধারণের জীবনযাত্রায় কোন পরিবর্তন আসবে না। তারা নিজের নিজের বংশানুক্রমিক পদ্ধতিতে চাষবাস বা অন্য ব্যবসাপত্র চালিয়ে যেতে থাকুক নির্ভয়ে, পরম শান্তিতে।

উনি আশা-ভরসাও দিলেন অনেক। ভারতে যত রাজশক্তি আছে বর্তমানে, তার মধ্যে রাষ্ট্রকূটই যে অগ্রগণ্য, তা না জানে কে ? সেই বৃহত্তম রাজশক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে পারা যে প্রজাগণের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের সূচক, এটাই বা না মানবে কে ? অতঃপর অবন্তীবাসীর সুখ-সুবিধার অন্ত থাকবে না। পৌরাণিক বিক্রমাদিত্যের সময়কার সেই স্বর্ণ যুগ ফিরে আসবে আবার, শিপ্রানদীর তীরে অধিষ্ঠান করে মহাকাল চিরদিন নিরাপদে রক্ষা করবেন রাষ্ট্রকূটাশ্রিত অবন্তীওয়ালাদের।

রাজপুরুষটির ভাষণ শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞান্তেই বুঝি বৎসরাজ খানিকটা এগিয়ে চলে গিয়েছিলেন অন্য সবাইকে অতিক্রম করে। হঠাৎ বক্তার দৃষ্টি পড়ে গেল তাঁর উপরে। কয়েক মুহূর্তের জন্য বক্তৃতা তাঁর বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আবার আরম্ভ করলেন বটে, কিন্তু শেষও করলেন তাড়াতাড়ি। শেষ করে বৎসরাজকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কে ?"

বৎসরাজ আত্মপরিচয় দিতে বরাবরই অনিচ্ছুক। গ্রামবাসীদের কাছেও দেন নি, এই নবাগত বক্তৃতাবাগীশের কাছেও দেবেন না। মনে মনে তিনি অভিশাপ দিচ্ছেন নিজের গৌরকান্তি আর রাজমহিমামণ্ডিত মুখশ্রীকে। নলরাজা বনবাস কালে কদর্য মূর্তি লাভ করেছিলেন তক্ষক দংশনে। সে তাঁর শাপে বর হয়েছিল। নলের মত সুকৃতি নেই বৎসরাজের, তক্ষকে কামড়ালে তিনি হয়ত মারাই পড়বেন। সে ভয় না থাকলে তিনি এতদিন তক্ষকের কোটরে হাতই ঢুকিয়ে দিতেন কবে। বনের ভিতর বট-গাছটার গায়ে ফোকরে ফোকরে আছে ওরা।

সে কথা থাকুক, রাজপুরুষ দেখেছেন এবং ডেকেছেন। এগিয়ে গিয়ে কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। মরিয়া হয়ে এগিয়ে গিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন হয়েছে—"তুমি কে ?"

রাজ-রক্ত দেহে বহমান, নিজে বসেও এসেছেন কিছুদিন মরুরাজ্যের পৈতৃক সিংহাসনে। সম্ভ্রমহীন সম্বোধনটার দরুন রাজপুরুষের উপরে ক্ষেপে ওঠা স্বাভাবিক ছিল বৎসরাজের। কিন্তু ক্ষেপে ওঠার দিক দিয়েও গেলেন না তিনি। আশ্বস্ত, পুলকিত হয়ে উঠলেন বরং। না, সন্দেহ কিছু হয় নি লোকটার।

বিনয়ে বিগলিত হয়ে বৎসরাজ জবাব দিলেন—"ধর্মাবতার ! গুর্জর প্রতিহারবংশীয় সৈনিক আমি। মরুরাজ্য মুসলিম করগত হওয়ার পরে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি, এইখানে এসে কুঁড়ে বেঁধেছি একটু। মহান্ রাষ্ট্রকূট সম্রাটের আশ্রয় লাভে ধন্য হলাম আজ !"

"সৈনিক বলছ নিজেকে"—রাজপুরুষটি বৎসরাজের কথার ভঙ্গীতে চমৎকৃত—"আবার গুছিয়ে কথাও ত বেশ বলতে জান দেখছি। কী পদে ছিলে মরুরাজ্যে, ঠিক বল। সেনা বিভাগে ? না, মন্ত্রণালয়ে ?"

"কিছু না, কিছু না"—বৎসরাজ ক্রমশঃ বিপন্ন বোধ করছেন—"অতি সামান্য লোক, বলবার মত পরিচয় কিছু নেই আমার। নিজেকে সৈনিক বলি শুধু এই কারণে যে, তরোয়ালখানা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বাগিয়ে ধরতে জানি। বাবার কাছেই শিখেছিলাম ওটা। গুর্জর প্রতিহারেরা সবাই শেখে তাই।"

"কাজ কী করতে, তা ত কিছুই বললে না"—রাজপুরুষের কথায় কৌতুকের রেশ। বৎসরাজের সাফাই যে তিনি বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করতে পারছেন না, এটা স্পষ্ট।

"কাজ ?"—কী জবাব দেবেন, একমুহূর্ত সময় লাগল ভেবে নেবার জন্য—তারপর যা মুখে এল, তাই বলে ফেললেন—"প্রতিহারী! প্রতিহারী! এক মাঝারী রাজকর্মচারীর বাড়ির দরোয়ান।"

হাসতে গিয়েও হাসি চাপলেন রাজপুরুষ—"বেশ, প্রতিহারবংশীয় প্রতিহারী, আমার সঙ্গের এই একশোটা সৈনিককে দেখতে পাচ্ছ ত?"

"সৈনিক বলছ নিজেকে!" [পৃষ্ঠা ৫৭২

"তা পাচ্ছি বই কি!"—বললেন বৎসরাজ।

"এদের নায়েক যে ছিল, সে হঠাৎ মারা গেল, পথে আসতে আসতে। একটা দুর্ঘটনায়। সেই থেকে একটা মুশকিল হয়েছে এই, নতুন নায়েকের পদে বসাবার মত নতুন একটা লোক আমি পাচ্ছি না। এদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে পেরে উঠবে ও-কাজ। এরা লড়তে পারে ভীমের মত, কিন্তু সৈন্যাপত্যের জন্য চাই অর্জুন-গোত্রীয় লোক। তা ওরা নয়। তাই দেখ না, কোমরে তরোয়াল, হাতে ভল্ল আছে যদিও, দাঁড়িয়ে আছে যেন মেলায় এসে সং দেখছে।"

বৎসরাজের অজ্ঞাতেই তাঁর মাথাটা নড়ে উঠল। রাজপুরুষের কথায় সায় দিচ্ছেন তিনি। সৈন্যদলটাকে দেখে হুবহু ঐ কথাই তাঁর মনে হয়েছিল প্রথমে।

"এখন আমার বক্তব্যটা শোন"—বলছেন রাজপুরুষ—"দরোয়ান হও আর যাই হও, আমার বিশ্বাস লোকগুলোকে সৈনিকের মত চলাফেরার শিক্ষা তুমি দিতে পারবে। বিরাট রাজার রান্নাঘরে চচ্চড়ি রাঁধতে বসেও কীচক বধের কৌশলগুলো ভুলে যান নি ভীম।"

চোখে চোখে কী কথা হল দুইজনে? ঐ রাজপুরুষে আর বৎসরাজে?

যে-কথাই হোক, রাষ্ট্রকূট শিবিরে নায়েক পদে সেই দিনই ভরতি হয়ে গেলেন বৎসরাজ। শিবিরেই তাঁকে থাকতে হচ্ছে, কাজেই নিজের নতুন কুঁড়েটা তিনি ঘুটেকুড়োনি এক বুড়ীকে দান করে দিলেন অযাচিত ভাবে।

গ্রামের লোক ? তারা অনেকেই বলল—"ধর্মাবতারটি একচোখো। চাকরিটা পাওয়ার মত যোগ্য লোক এ-গাঁয়ে আরও এক কুড়ি ছিল। তবে তাদের রং অত ফরসা নয়, আর নাক অমন খাঁড়ার মতন নয়। হায় রে কলিকাল ! গুণের আদর কেউ করে না, রূপ দেখে পাগল সবাই।"

যা হোক, কয়েকদিন পরে ও-গাঁয়ের শিবির ভেঙে অন্য গাঁয়ে চলে গেলেন রাজপুরুষ। এমনি ভাবে নানা স্থান ঘুরতে ঘুরতে বছর কাটিয়ে অবশেষে যখন মান্যক্ষেত্রে সদলে প্রবেশ করলেন তিনি, তখন রাজপথে ভিড় জমে গেল তাঁর একশোটা সৈনিকের কুচকাওয়াজ দেখবার জন্য। অমন দৃপ্ত পদক্ষেপ, অমন সুশৃঙ্খল দৃঢ়তাব্যঞ্জক অঙ্গচালনা একমাত্র সম্রাটের নিজস্ব দেহরক্ষী বাহিনীর মধ্যেই দেখা গিয়ে থাকে। তাদের শিক্ষক হলেন স্বয়ং যুবরাজ গোবিন্দ।

আঞ্চলিক পরিদর্শকেরা রাজধানীতে প্রবেশ করবার পর তাঁদের প্রথম করণীয় হল সম্রাটসকাশে উপনীত হওয়া এবং মৌখিকভাবে তাঁর কাজকর্মের বিবরণী দাখিল করা। আমাদের এই রাজপুরুষটিকেও তা করতে হল।

কিন্তু, বিবরণীর সূত্রপাতেই বাধা পেলেন তিনি, স্বয়ং সম্রাটের কাছ থেকে। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন—"কী হে, তুমি না কি পথের ধুলোয় মানিক কুড়িয়ে পেয়েছ ?"

ভদ্রলোক ত হতভম্ব ! কথার অর্থ বুঝতে না পারলে কী জবাব দেবেন ?

সম্রাটই সাহায্য করলেন অর্থ বুঝতে। "তোমার নগর-প্রবেশের সময় প্রধান সেনাপতি দাঁড়িয়েছিলেন নিজের গবাক্ষে। তিনি দেখেছেন তোমার সৈনিকদের, আর তাদের নায়েককেও। মানিক বলতে সেই নায়েকের কথাই বলেছি আমি। তোমার বিবরণ পরে শুনব, আগে সেই মানিকটিকে আনাও সভাতে।"

সেই দিনই বৎসরাজ নিযুক্ত হলেন মহাপ্রতীহার পদে। সম্রাট ঠাট্টা করে তাকে বলেছিলেন—"প্রতীহারবংশের বীর তুমি, প্রতীহারী পদেই তুমি কাজ কর।"

কিন্তু সেনাপতি তাঁকে ডেকে নিয়ে দিলেন নতুন নির্দেশ।

"মরুরাজ্যে চাকরি করতে তুমি। মুসলমান আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়েছে সে-রাজ্য। সে আক্রমণ তুমি চোখে দেখেছ নিশ্চয়। দেখে-শুনে ঐ তুর্কীদের রণকৌশলে অভিনবত্ব কিছু লক্ষ্য করে থাক যদি, সেইটে তুমি শেখাবে আমাদের, এই প্রত্যাশা নিয়েই সম্রাট তোমাকে নিজের কর্মে নিয়োগ করেছেন। নামে তুমি মহাপ্রতীহার, সে পদও খুব সম্মানের পদই, কিন্তু কাজ তোমাকে যা করতে হবে, তা হল রণনীতি-বিশারদের। পারবে ত ?"

বৎসরাজ বললেন—"পারব।"

নতুন আশার আলো তিনি দেখতে পেয়েছেন এতদিনে। রণকৌশল ? শত্রুভাবে

দীর্ঘদিন সিন্ধু দেশাগত তুর্কীদের সাথে লড়েছেন তিনি। ওদের উন্নততর রণকৌশলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে যতই অক্ষম মনে হোক, নৈরাশ্যের দরুন আত্মহারা, বিমূঢ় হয়ে যান নি কখনো। হারতে হারতেও পর্যবেক্ষণ করেছেন ওদের সেনানীদের কার্য-কলাপ। নৈশ অন্ধকারে অরণ্যের আশ্রয়ে লুকিয়ে মনে মনে পর্যালোচনা করেছেন সিংহাসনের মূল্যে ক্রীত সেই তিক্ত শিক্ষার।

বীরত্ব? ভারত সন্তানের তা কম ছিল না কোনদিন। ইদানীংকাল প্রতীহারদেরও না। তবু তারা হেরেছে। তুর্কীর বীরত্বের কাছে নয়, তুর্কীর কৌশলের কাছে। সে কৌশল সম্বন্ধে আজ আর অনভিজ্ঞ নন বৎসরাজ। নিজের আজ সেনাবল নেই। রাষ্ট্র-কূটের সেনাকেই তিনি শিক্ষিত করে তুলবেন সেই রণকৌশলে। নিজের রাজ্য তাতে উদ্ধার না হতে পারে, কিন্তু বৃহৎ ভারতের বাকী বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলির প্রতিরক্ষা তাতে বলিষ্ঠ হবে আরও।

রাজধানীতে নয়, সহ্যাদ্রিশিখরের যমদুর্গে কাজ শুরু হল বৎসরাজের। এক একটা করে সৈন্যদল সেখানে যায়। হাজার সৈনিক প্রত্যেক দলে। ছয়মাস কাল তারা শিক্ষালাভ করে মহাপ্রতীহারের কাছে। শিক্ষা শেষে তারা যমদুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে নতুন আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তি চোখে নিয়ে। তুর্কীর কৌশলেই আজ তারা তুর্কীকে শায়েস্তা করতে পারবে।

দীর্ঘ দশ বৎসর কেটে গেল। মরুরাজ্য থেকে পূর্বপানে দিগ্বিজয়ে বেরুচ্ছেন মুসলিম সুলতান হামিদ আনোয়ার। খবর এল গুপ্তচরের মুখে।

পূর্ব বলতে মাড়োয়ার, যশল্মীর—এঁরা এখনও স্বাধীন হিন্দুরাজার পতাকা সগৌরবে উড্ডীন রেখেছেন। রাষ্ট্রকূট সম্রাট তাঁদের কাছে দূত পাঠালেন। মুসলিম আক্রমণ আসন্ন, এই সতর্কবাণী তাঁদের কানে শোনাবার জন্য। সে আক্রমণ প্রতিরোধে রাষ্ট্রকূটের সাহায্য তাঁরা পেতে পারেন, এই আশ্বাসও তাঁদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য।

দুর্ভাগ্য তাঁদের। তাঁরা এই উদার প্রস্তাবের ভিতরে রাষ্ট্রকূটের স্বার্থসন্ধানী মনোবৃত্তির গন্ধ পেলেন। ভাবলেন—সন্ধির অছিলায় অন্তরঙ্গতা প্রতিষ্ঠা করে ক্রমে রাজ্যগুলিকেই গ্রাস করবার মতলব রাষ্ট্রকূট সম্রাটের। তাঁরা ভদ্রভাবেই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, "আমাদেরও গুপ্তচর আছে। তারা এমন কথা বলছে না এখনো যে মুসলিম আক্রমণ আশু অবশ্যম্ভাবী। যদি প্রয়োজন ঘটে, রাষ্ট্রকূটের সর্বজয়ী শক্তির সাহায্য আমরা চাইব বই কি!"

সম্রাট ধ্রুব হতাশ হয়ে নিশ্বাস ফেললেন একটা। যাক, ওদের সম্বন্ধে আপাততঃ তাঁর আর করণীয় নেই কিছু। তবে নিজের সম্বন্ধে?

মাড়োয়ার যশল্মীরকে হিসাব থেকে বাদ দিলে মরুরাজ্যের নিকটতম অন্য হিন্দুরাজ্য রয়েছে অবন্তী, সেটা রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যেরই অংশবিশেষ। এখন প্রথম কর্তব্য হল অবন্তীর রক্ষাব্যবস্থাকে দুর্ভেদ্য করে তোলা।

সে কাজে বৎসরাজের মত দক্ষ লোক আর কোথায় পাওয়া যাবে? অতএব যমদুর্গ থেকে অবসর নিয়ে মহাপ্রতীহার বৎসরাজকে অবন্তীতে এসে নতুন কর্মভার নিতে হল রাজপ্রতিনিধির। রাজধানী হল তাঁর উজ্জয়িনী।

বৎসরাজের নিপুণ করস্পর্শে সারা অবন্তী দেশে রূপান্তর এল একটা দু'দিনেই। উজ্জয়িনী রাজধানী হয়ে উঠল একটা রণক্ষেত্রের মতই। শিপ্রাকূলে উঠল উঁচু প্রাচীর, পথে পথে খনিত হল গভীর পরিখা, আপাততঃ সেগুলি তক্তার আচ্ছাদনে ঢাকা রয়েছে, শত্রুর সাড়া পেলেই তুলে নেওয়া হবে সে আচ্ছাদন। প্রত্যেকটা বাড়িকে সুরক্ষিত করা হল দুর্গের মতন করে।

নগরবাসীরা অবাক্ হয়ে ভাবে—কেন এ তৎপরতা? দেশে শত্রুর আক্রমণ ত লেগেই আছে, আবহমানকাল থেকেই! তৎপরতা যা কিছু দেখা যায় তা শত্রুসেনা এসে পড়ার পূর্ব-মুহূর্তে। এবার ত উলটো ব্যাপার দেখা যাচ্ছে। শত্রু কোথায়? অবন্তীর সীমানা পেরিয়ে রাজোয়ারা, রাজোয়ারার ওপারে বিস্তীর্ণ মরুভূমি, সেই মরুর ওধারে ভরোট নগরে কোথায় নাকি আছে তুর্কী সেনা। আক্রমণ আসবে না কি তাদেরই দিক থেকে।

আসেও যদি, এই বিরাট দূরত্ব কি তারা এক দিনে অতিক্রম করে আসবে? নব রাজ-প্রতিনিধি বাড়াবাড়ি করছেন একান্তই—এতে একমত হল প্রজারা। প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠার সাহস অবশ্য হয় নি তাদের। কিন্তু সহযোগিতা?—আদৌ না।

এ কাজে তাদেরও সহযোগিতার আবশ্যক যে আছে, এটা তাদের কেমন করে বোঝানো যাবে? বৎসরাজের সে-সময় নেই। সময় থাকলেও বোঝানো শক্ত হত। চিরদিন লোকে দেখে আসছে—যুদ্ধ করবার দায় শুধু রাজার ও তাঁর বেতনভুক্ সেনাপতি ও সিপাহীদের। জনসাধারণ কোনদিন মাথা দেয় না ওর ভিতর। আগের রাজা যদি ভাগ্যদোষে পরাজিত হন, প্রজারা বিনা দ্বিধায় বিজেতাকে বরণ করে নেয় রাজা বলে। তাদের জীবনযাত্রার হেরফের হয় না একটুও।

এবারে অবশ্য তফাৎ একটু হচ্ছে, আক্রমণকারীরা বৈদেশিক তুর্কী এবং অন্য ধর্মীয় বলে। তা, সিন্ধুদেশেও তারা রাজত্ব করছে ত! অনেক দিন ধরেই করছে। অত্যাচার? এমন কি অত্যাচার তারা করতে পারে? কই, তেমন কিছু শোনাও ত যায় না!

এই রকম যেখানে মনোবৃত্তি, সেখানে প্রজাসাধারণকে বোঝাতে হল, চাই দুর্দান্ত ধৈর্য আর অধ্যবসায়। বৎসরাজের স্বভাবে ও দুটোর অভাব হয়ত নেই, কিন্তু হাতে তাঁর

সময়ের অভাব রয়েছে। জনগণের শুভবুদ্ধি উদ্রেকের প্রচেষ্টাকে মুলতুবি রেখে আপাততঃ তিনি তাই সীমান্ত রক্ষায় পরিপূর্ণভাবে মনোযোগী হলেন। দুর্গের পরে দুর্গ গড়ে তুলতে লাগলেন যশল্মীর সীমান্তে। শত্রু যেদিন ঝাঁপ দেবে যুদ্ধে, যশল্মীরের ক্ষুদ্র রাজ্য পেরিয়ে আসতে তিনদিনও লাগবে না তাদের। দুটো যুদ্ধ বড় জোর হবে। প্রথমটা বড়, শেষটা নাম মাত্র। পরাজয় দুটোতেই অনিবার্য। তার পরে পালা আসবে অবন্তীর।

একটা বিশাল বাহিনী সর্পিল গতিতে এগিয়ে আসছে।

বৎসরাজ চমক খাইয়ে দিলেন ভারতবাসীকে সেদিন। হিসাব তাঁর যে হুবহু ঠিক। তা প্রমাণ হয়ে গেল কার্যকালে। মরুরাজ্য থেকে যশল্মীরেই প্রবেশ করল তুর্কী সেনা। ক্ষুদ্র যশল্মীরের প্রত্যেকটা সমর্থ পুরুষকে যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে এনেও রাজা ভূধর সিং দশ হাজারের বেশী সৈনিক একত্র করতে পারলেন না। তারা অবশ্য লড়বে দানবীয় শক্তি নিয়ে। চিরদিনই তাই লড়েছে। কিন্তু লড়লেও তারা কচুকাটা হবে। তাই হয়েছে চিরদিনই।

কিন্তু এবার এই চিরন্তন পারম্পর্যে ব্যতিক্রম ঘটল একটা। সেই ব্যতিক্রমের হেতু শ্রীল বৎসরাজ। তুর্কী সেনা মরুরাজ্য থেকে যশল্মীরের দিকে যাত্রা করেছে। এ-খবর আগে আগেই তিনি পেয়ে গেলেন গুপ্তচর প্রমুখাৎ। অমনি রণযাত্রা করল অবন্তীর সেনাও। সম্রাট ধ্রুব যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন বৎসরাজকে।

ওদিক থেকে তুর্কী সেনা, এদিক থেকে অবন্তী সেনা যুগপৎ ধেয়ে গেল যশল্মীর লক্ষ্য করে। যশল্মীরের ক্ষুদ্র বাহিনীর দৃষ্টি পশ্চিমপানে, যেখান থেকে শত্রুরা আসছে। তুর্কীদের দৃষ্টি সন্নিহিত যশল্মীরের দিকেই নিবদ্ধ। তাদের পশ্চাতে গিরিদরীর আড়ালে আড়ালে যে আর একটা বিশাল বাহিনী সর্পিল গতিতে বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে আসছে, সে খবর তারা পায় নি। পায় নি যশল্মীরীরাও।

তুর্কীরা খবর যখন পেল, তখন দেরি হয়ে গিয়েছে বড় বেশী। মুখোমুখি লড়াইয়ে যখন তারা ব্যাপৃত রয়েছে যশল্মীর সেনার সঙ্গে, নির্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রপাতের মত হঠাৎ

তারা ডাইনে বাঁয়ে একসাথে আক্রান্ত হল অজানা অচেনা দুটো সেনাদলের দ্বারা। দুটো সেনাই অবশ্য অবন্তীরই। নিজের বাহিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করে বৎসরাজ দুই পথে তাদের পরিচালিত করেছেন শত্রুকে ঘিরে ফেলবার জন্য।

যে-পথ দিয়ে এসেছিল, সে-পথে আর ফিরল না তারা। ফিরল না একটাও তুর্কী। যশল্মীরের লাল বালুকা আরও লাল হয়ে গেল তাদের রক্তস্রোতে। অনধিকার প্রবেশের জন্য যশল্মীরের রাজার কাছে দূতমুখে একটা ক্ষমা প্রার্থনার বাণী পাঠিয়ে ধুলো পায়েই বৎসরাজ ধেয়ে চললেন নিজের অপহৃত রাজ্যপাট পুনরুদ্ধারের জন্য। কে তাঁকে বাধা দেবে? তুর্কী সেনার বৃহদংশ ত যশল্মীরের মাটিতেই পড়ে আছে। অতঃপর মরুরাজ্যের দিকে আর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপের সাহস তুর্কীদের হয় নি। দুর্মদ সেনা বৎসরাজের আজ্ঞাবহ, রাষ্ট্রকূট শক্তি তাঁর পৃষ্ঠরক্ষক, সমগ্র রাজোয়ার তাঁর সমর্থক।

শেষ জীবনে বৎসরাজ পশ্চিম ভারতে সম্রাট বলেই স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

দুইয়ে দুইয়ে চার

মন খারাপ করে ছেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলে, মা জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁরে, তোর মন খারাপ হল কেন?

ছেলে—মাস্টার মশাই মেরেছেন।

মা—কেন?

একটা অঙ্ক মেলাতে পারিনি বলে মাস্টারমশাই বকুনি দিতে আমিও মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করি, বলুন তো কখন দুইয়ে দুইয়ে চার হয় না। মাস্টারমাশাই না পারাতে বোর্ডে লিখে দিলুম ২২। হেরে গিয়ে মাস্টারমশাই আবার বকলেন।

ভাড়াটিয়ার জন্য—

একটি ইতিহাস বিখ্যাত চোর

জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃটেনের ইতিহাসে নানা কারণেই 'খ্যাতনামা মিঃ ব্লাড' একটি স্মরণীয় নাম। এরকম দুজয় চরিত্র সেখানে আর দুটি মিলবে কিনা সন্দেহ।

পুরো নাম কর্নেল পিটার ব্লাড, জাতে আইরীশ। নেশা ছিল তাঁর যত বিপদজনক দুঃসাহসিক কাজে ও ধনদৌলত সংগ্রহে।

এহেন ব্লাডের জীবনের বহু ঘটনা গল্পের চেয়েও অবিশ্বাস্য। যেমন, একা আয়র্ল্যাণ্ডের ডাবলিন দুর্গ আক্রমণ ও ডিউক অব অর্মণ্ডকে হত্যার প্রচেষ্টা। আর এই কর্নেল ব্লাডই একা ক্যাপ্টেন ম্যানসন নামে জনৈক রাজবন্দীকে পনেরো জন সশস্ত্র সৈন্যের পাহারার ভেতর থেকে ছিনিয়ে বের করে নিয়ে মুক্ত করে দিতে সক্ষম হন।

কিন্তু এসবের চাইতেও যে কারণে কর্নেল ব্লাড স্মরণীয় সে হচ্ছে, "ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি ইংল্যাণ্ডের রাজাদের বহুমূল্য জহরত চুরি করেন।"

ঘটনাটি এই ঃ

১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দের এক বসন্তের সকাল। লণ্ডনের ঐতিহাসিক টাওয়ার বা তোরণের মার্টিন টাওয়ারে জনৈক মৃদুভাষী গ্রামবাসী যাজক ভদ্রলোক সস্ত্রীক দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের নজর ছিল ইংল্যাণ্ডে রাজবংশের সংরক্ষিত জড়োয়াগুলির দিকে। তখনকার দিনে

জহরতগুলি রাখা হত একটা লোহার খাঁচার মধ্যে, যার পাহারার ভার ছিল ট্যালবট এডওয়ার্ডস্ নামে একজন বৃদ্ধলোকের উপর। ইনি টাওয়ার বিল্ডিংএর উপরের দুতলায় সপরিবারে বসবাস করতেন।

এডওয়ার্ডস্ এই দম্পতির দিকে প্রথমটা তেমন লক্ষ্যও করেন নি। শেষটা যখন সেই গ্রাম্য যাজক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে জানালেন, তার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থবোধ করছেন, শুধু তখনই তার মনোযোগ যা কিছু আকৃষ্ট হল তাঁদের দিকে।

তারপর তিনি এঁদের দুজনকে উপরতলায় নিজের বাসস্থানে নিয়ে গেলেন। এখানে শ্রীমতী এডওয়ার্ডস্ আগন্তুক মহিলাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে তাঁর খানিক বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন।

এইভাবে ব্লাডের জহরত চুরি পরিকল্পনার প্রথম ধাপ সফল হল।

এর কয়েকদিন পরই শুরু হল তার পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ। এবারেও গ্রাম্য যাজকের ছদ্মবেশে তিনি আবার টাওয়ারে গিয়ে এডওয়ার্ডস্ দম্পতির সঙ্গে দেখা করলেন— তাঁর স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ দেবার অছিলায়, তিনি শ্রীমতী এডওয়ার্ডস্কে একজোড়া রেশমী দস্তানা উপহার দিলেন। এইভাবে শীঘ্রই উভয় দম্পতির পরস্পরের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা হল। এরপর কয়েক সপ্তাহ বাদে ব্লাড এডওয়ার্ডস্এর বিয়ের যোগ্য মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ের এক প্রস্তাব তুললেন। এই উদ্দেশ্যে একটি নৈশ-ভোজেরও আয়োজন করা হল, যাতে এই বিষয় নিয়ে উভয় পক্ষে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। একফাঁকে ব্লাড কৌশলে প্রস্তাব করলেন যে তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুও এই ভোজসভায় যোগ দেবেন। এডওয়ার্ডস্ও এতে তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন।

ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ব্লাড তার সঙ্গীদ্বয় সহ বেশ কিছু আগেই এসে পৌঁছালেন ও স্ত্রীকে সঙ্গে আনতে না পারার দরুন মাফ চেয়ে জানালেন, তাঁর স্ত্রী আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শ্রীমতী এডওয়ার্ডস্ ও তাঁর মেয়ে খাবারের যোগাড় দেখতে অন্যত্র চলে গেলে ব্লাড এডওয়ার্ডস্কে অনুরোধ করলেন, তার বন্ধুদ্বয়কে রাজকীয় জহরতগুলি দেখাতে।

এডওয়ার্ডস্ সম্মত হলেন। দরজা খুলে আগন্তুকদের নিয়ে ঢুকলেন জহরতের কামরার ভেতরে। ঢুকে দরজাটা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল এডওয়ার্ডস্-এর উপর। প্রহারে অচৈতন্য করে তার মুখে রুমাল গুঁজে গোঙানির আওয়াজ বন্ধ করল।

ব্লাড এরপরে জহরতের কামরা থেকে 'এডওয়ার্ড দি কনফেসরের' ঐতিহাসিক রাজমুকুট, যা দিয়ে ইংল্যাণ্ডের রাজা ও রানীদের অভিষেক হয়, সেটা তুলে নিয়ে তার পরিধেয় যাজকের লম্বা আলখাল্লার নীচে কোমরে ঝোলানো একটি থলেতে পুরলেন। তার অন্য সহকর্মীদের একজন তুলে নিলেন রাজদণ্ডের গোলকটি। অন্যজন রাজদণ্ডটিকে উকো দিয়ে

ঘষতে লাগলেন সেটিকে খাটো করে বহনযোগ্য করে তুলবার জন্য।

দস্যুতার দ্বিতীয় ধাপও পরিকল্পনা অনুযায়ীই সম্পূর্ণ হল। কিন্তু তারপর, তারপরই হল গোলমালের সূত্রপাত।

আগন্তুকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল এডওয়ার্ডস্‌এর উপর।　　[পৃষ্ঠা ৫৮০

ট্যালবট এডওয়ার্ডস্‌এর একটি ছেলে ছিল, যে ফ্ল্যাণ্ডার্স‌এ সেনাবাহিনীতে কাজ করত। সে হঠাৎ ঐ দিনই ছুটি পেয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়িতে এসে হাজির—বাপ, মা, বোনকে আচমকা তাক লাগিয়ে দেবে বলে! সে এসে বাসার কাছে বাপ, মা কাউকেই দেখতে পেল না—দেখতে পেল শুধু ব্লাডের পাহারায় বসানো লোকটিকে দরজার কাছে। এতে সে অবাক্ ও সন্দিগ্ধ হয়ে, একটা কোন কিছু গোলমাল হয়েছে আশঙ্কা করে, ছুটে উপর তলায় উঠে গেল—মা আর বোনের কাছে।

সেখানে সে জানতে পারল আগন্তুক অতিথিদের কথা। সে ফের ছুটে গেল জহরতের কামরায়। সেখানে গিয়ে দেখল দরজা খোলা, তার বাবা মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে। রাজকীয় জহরতগুলি অপহৃত! সেই সঙ্গে ব্লাড ও তার সঙ্গীদ্বয়ও বেপাত্তা!

এডওয়ার্ডস্‌এর ছেলে তখন সঙ্গে সঙ্গে খুব হইচই হাঁক-ডাক শুরু করে দিল। সে রাতে অন্ধকার ছিল বেশ গাঢ়। তারই মাঝখানে টাওয়ার অব লণ্ডন যেন এক তাণ্ডবের কুরুক্ষেত্রে পরিণত হল। সেই হইচই গণ্ডগোলের মাঝখানে যাজক বা পাদরীর আলখাল্লাপরা ধূর্ত চূড়ামণি কর্নেল ব্লাড অপরাধীদের পশ্চাদধাবণকারীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে যেন তাদেরই একজন হয়ে সমানে চিৎকার করে চলেছেন, "ঐ ঐ যে পালাচ্ছে, চোর চোর, ধর ধর, পাকড়ো" এই বলে যারা অন্ধকারে চোর খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদেরই দেখিয়ে দিচ্ছে!

এই হই-হল্লা ডামাডোলের মাঝখানেও অপরাধীরা টাওয়ারের বাইরে সেণ্ট ক্যাথারীনস্ ওয়াকএর কাছে ঘোড়ায় চড়ে পালাতে গিয়ে কিভাবে জানি ধরা পড়ে গেল। তাদের কাছ

থেকে যাবতীয় অপহৃত রাজকীয় জহরত প্রায় সমুদয়ই উদ্ধার করা হয়। খালি কয়েকটি দামী পাথর যা ধস্তাধস্তির সময় কোথাও পড়ে গিয়েছিল, সেগুলি আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

মধ্যযুগীয় তৎকালীন মানসিকতা থেকে বর্তমানে যে কেউ আশা করবে, এরপর হয়ত বন্দী কর্নেল ব্লাডকে হয় ফাঁসি দেওয়া হয়, নয় ঐ জাতীয় তৎকালীন প্রচলিত আরও কোন বীভৎস সাজা দেওয়া হয়। কারণ, যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় মানুষের জীবন ছিল অতি সস্তা মূল্যহীন। কথায় কথায় প্রাণ দেওয়া নেওয়া ছিল তখন যেন ছেলেখেলা।

কিন্তু সেসব কিছু হল না তাঁর, এটাই আশ্চর্য। রাজা দ্বিতীয় চালস তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি গোটা ব্যাপারটিকে এমন হালকাভাবে নিলেন যেন এটা একটা ভারী মজার ঘটনা। এমন কি তিনি ব্লাডকে বাৎসরিক ৫০০ পাউণ্ডের একটা অবসর-ভাতাও মঞ্জুর করলেন।

এর থেকে লোকের মনে সন্দেহ হল যে, রাজা স্বয়ং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

সর্বদা নগদ অর্থের অভাবে পীড়িত হয়ে তিনিই কি নিজের সম্পত্তি নিজে চুরি করে নগদ অর্থের ঘাটতি মেটাবার এই অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন? অথবা মতান্তরে তিনি কি বাজি ধরেছিলেন, যে রাজকীয় জহরত কেউ চুরি করতে পারে না, পারবে না এবং সেই বাজি ব্লাড গ্রহণ করেছিল? এবং শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিল রাজাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ইচ্ছে করেই?

যে যা খুশী ভাবতে পারেন। কিন্তু একটা ব্যাপার সুনিশ্চিত—কর্নেল ব্লাড তাঁর সারা বাকী জীবন ধরে বাৎসরিক ৫০০ পাউণ্ডের বৃত্তি নিয়মিত ভোগ করেছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের রাজকীয় জহরতগুলিকে পরে মার্টিন টাওয়ার থেকে সরিয়ে নিয়ে ওয়েকফিল্ড টাওয়ারে রাখা হয়। সেখানে সেসব আজও দেখা যাবে। একটি চুরি প্রতিরোধক শো কেসএর মধ্যে সেগুলিকে রাখা হয়েছে ও তাদের পাহারায় রয়েছে একগাদা আসল গরুখেকো গোরা সৈন্য! টাওয়ার কর্তৃপক্ষ আর এতটুকু সুযোগ দিতে রাজী নন দস্যু তস্করদের।

———

৫৬৩ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর

কাচের কাপ। অন্য জিনিসগুলি সবই লোহাজাত দ্রব্য।

অনিল ভৌমিক

৬

তারপর গুহার মুখে এসে দড়িটা ধরে কীভাবে নেমে এসেছিলাম আজও জানি না। পর পর পাঁচদিন ধরে শুধু বুনো ফল আর ঝরনার জল খেয়ে হাঁটতে লাগলাম। গভীর জঙ্গলে কতবার পথ হারালাম, বুনো জন্তু জানোয়ারের পাল্লায় পড়লাম। তারপর যেদিন এক সন্ধ্যের মুখে ওলাঙ্গির বাজারে এসে হাজির হলাম সেদিন আমার চেহারা দেখে অনেকেই ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল।"

মকবুলের গল্প শেষ হল। দুজনেই চুপ করে বসে রইল। দুজনের কারোরই খেয়াল নেই যে রাত হয়েছে। এবার দোকান বন্ধ হবে।

—এই দেখুন—মকবুল ডান হাতটা বাড়াল। মাঝের মোটা আঙুলটায় একটা হীরের আংটি।

—সেই হীরের টুকরো নাকি? ফ্র্যান্সিস বিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

মকবুল মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল, বলল—বুঙ্গা যখন হাতুড়ি চালাচ্ছিল তখন কয়েকটা টুকরো ছিটকে এসে আমার জামার আস্তিনে আটকে গিয়েছিল। তখন জানতে পারি নি, পরে দেখেছিলাম।

দোকানী এসে তাড়া দিল, রাত হয়েছে, দোকান বন্ধ করতে হবে।

দু'জনে উঠে পড়ল।

দোকানীর দাম মেটাতে গিয়ে ফ্র্যান্সিস ওর থলিটা বের করল। সুলতানী মুদ্রা-

গুলোর সঙ্গে মোহরটাও ছিল। মোহরটা দেখে মকবুল যেন হঠাৎ খুব চঞ্চল হয়ে পড়ল। থাকতে না পেরে বলেই ফেলল—মোহরটা একটু দেখব ?

—দেখুন না—ফ্র্যান্সিস মোহরটা ওর হাতে দিল। ফ্র্যান্সিস দাম মেটাতে ব্যস্ত ছিল। তাই লক্ষ্য করল না। মোহরটা দেখতে দেখতে মকবুলের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। কিন্তু নিজের মনের ভাব গোপন করে ও মোহরটা ফিরিয়ে দিল।

—সুন্দর মোহরটা, রেখে দেওয়ার মত জিনিস।

—হুঁ—রাখতে আর পারলাম কই ? ফ্র্যান্সিস সখেদে বলল।

—কেন ?

—আর একটা ঠিক একরকম দেখতে মোহরও ছিল।

—কী করলেন সেটা ?

—এখানকার বাজারে এক জহুরীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি।

—ইস্—মকবুল মাথা নাড়ল—ও ব্যাটা নিশ্চয়ই ঠকিয়েছে আপনাকে।

—কী আর করব নইলে না খেয়ে মরতে হত।

—কোন্ জহুরীর কাছে বিক্রি করেছেন ?

—রাস্তায় চলুন—দেখাচ্ছি।

রাস্তায় নেমে মকবুল জিজ্ঞেস করল—কোথায় থাকেন আপনি ?

—এখনো কোন আস্তানা ঠিক করিনি।

—বাঃ, বেশ—মকবুল হাসল—চলুন আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

—সুলতানের এতিমখানায়।

—এতিমখানায় !

—নামেই এতিমখানা—গরিব মানুষরা থাকতে পায় না। আসলে বিদেশীদের আড্ডাখানা ওটা।

—চলুন—মাথা তো গোঁজা যাবে।

রাস্তায় আসতে আসতে ফ্র্যান্সিস মকবুলকে জহুরীর দোকানটা দেখাল। মকবুল গভীরভাবে কী যেন ভাবছিল। দোকানটা দেখে মাথা নেড়ে শুধু বলল—ও। ফ্র্যান্সিস আন্দাজও করতে পারে নি মকবুল মনে মনে কি ফন্দি আঁটছে।

মকবুলের কথা মিথ্যে নয়। সত্যিই এতিমখানা বিদেশী ব্যবসায়ীদের আড্ডাখানা। কত দেশের লোক যে আশ্রয় নিয়েছে এখানে ! আফ্রিকার কালো কালো কোঁকড়া চুল মানুষ যেমন আছে, তেমনি নাক-চ্যাপটা কুতকুতে চোখ মোঙ্গল দেশের লোকও আছে।

মকবুল একটা ঘরে ঢুকল। দু'জন লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আর একটা বিছানা খালি, ওটাই বোধহয় মকবুলের বিছানা। ঘরের খালি কোণটা দেখিয়ে মকবুল বলল—ওখানেই আপনার জায়গা হয়ে যাবে, সঙ্গে তো আপনার বিছানাপত্তর কিছুই নেই ?

—না।

—আমার বিছানা থেকেই কিছু কাপড়চোপড় দিচ্ছি, পেতে নিন।

ফ্র্যান্সিস বিছানামত একটা করে নিল। সটান শুয়ে ক্লান্তিতে চোখ বুজল। শরীর যেন ভেঙে আসছে। শোওয়া মাত্র সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিল ঘরের অন্য দুজন লোকের সঙ্গে মকবুল মৃদুস্বরে কি যেন কথাবার্তা বলছে। সে সব কথার অর্থ সে কিছুই বুঝতে পারে নি।

ঘুম ভাঙতে ফ্র্যান্সিস দেখল—বেশ বেলা হয়েছে। লোকজনের কথাবার্তায় এতিমখানা সরগরম। ফ্র্যান্সিস পাশ ফিরে মকবুলের বিছানার দিকে তাকাল। আশ্চর্য ! কোথায় মকবুল ? মকবুলের বিছানাও নেই মকবুলও নেই। পাশের বিছানায় লোকটি তখন দুহাত ওপরে তুলে মুখ হাঁ করে মস্ত বড় হাই তুলছিল। ফ্র্যান্সিস তাকেই জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, মকবুল কোথায় ? লোকটা মৃদু হেসে হাতের চেটো ওলটাল অর্থাৎ সে কিছুই জানে না। মরুক গে—এখন হাতমুখ ধুয়ে কিছু খাওয়ার চেষ্টা দেখতে হয়, ভীষণ খিদে পেয়েছে। হাতমুখ ধুয়ে ঘরে এসে ফ্র্যান্সিস দেখল—ঘরের আর একজন তখন ফিরেছে। কিন্তু মকবুল একেবারেই বেপাত্তা। ফ্র্যান্সিস খেতে যাবে বলে থলেটা কোমর থেকে বের করল, কিন্তু এ কি ? থলে যে একেবারে খালি। সুলতানী মুদ্রাগুলো তো নেইই সেই সঙ্গে মোহরটাও নেই, সর্বনাশ ! এই বিদেশ বিভুঁই। কে চেনে ওকে ? মাথা গোঁজার ঠাঁই না হয় এই এতিমখানায় জুটল ! কিন্তু খাবে কী ? খেতে তো দেবে না কেউ। তার ওপর কাঁধের ঘাটাও এখনও শুকোয় নি। শরীরের দুর্বলতাও সবটুকু কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই অবস্থায় ও একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। ফ্র্যান্সিস চোখে অন্ধকার দেখল।

ওর চোখমুখের ভাব দেখে ঘরের আর দু'জনও বেশ অবাক্ হল। হল কি ভিনদেশী লোকটার ? ওদের মধ্যে একজন উঠে এল। লোকটার চোখের ভুরু দুটো ভীষণ মোটা। মুখটা থ্যাবড়া। ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে ?

ফ্র্যান্সিস প্রথমে কথাই বলতে পারল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল—হল কি ? ওরকমভাবে তাকিয়ে আছেন ?

—আমার সব চুরি হয়ে গেছে।

—ও, তাই বলুন। লোকটা নির্বিকার ভঙ্গীতে আবার বিছানায় গিয়ে বসল। বলল—এটা এতিমখানা—চোর জোচ্চোরের বেহেস্ত মানে স্বর্গ আর কি? তা কত গেছে?

ফ্র্যান্সিস আন্দাজে হিসেব করে বলল। মোহরটার কথাও বলল।

—ও বাবা। মোহরফোহর নিয়ে এতিমখানায় এসেছিলেন? কত সরাইখানা রয়েছে, সেখানে গেলেই পারতেন।

—মকবুলই তো যত নষ্টের গোড়া।

—কে মকবুল?

—কাল রাত্তিরে যার সঙ্গে আমি এসেছিলাম!

—কত লোক আসছে যাচ্ছে।

—কেন, আপনারা তো কথাবার্তা বলছিলেন মকবুলের সঙ্গে বেশ বন্ধুর মত।

—হতে পারে। হাত উলটে লোকটা বলল।

ফ্র্যান্সিস লোকটার ওপর চটে গেল। একে ওর এই বিপদ—কোথায় লোকটা সহানুভূতি দেখাবে তা নয় উলটে এমনভাবে কথা বলছে যেন সব দোষ ফ্র্যান্সিসের।

ফ্র্যান্সিস বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল—আপনারা মকবুলকে বেশ ভাল করেই চেনেন, এখন বেগতিক বুঝে চেপে যাচ্ছেন।

অন্য বিছানায় আধশোয়া লোকটা এবার যেন লাফিয়ে উঠল। বলল—তাহলে আপনি কি বলতে চান আমরা একটা গাঁট কাটার শাগরেদ।

—আমি সে কথা বলি নি।

—আলবৎ বলেছেন। ভুরু মোটা লোকটা বিছানা ছেড়ে ফ্র্যান্সিসের দিকে তেড়ে এল। ফ্র্যান্সিস বাধা দেবার আগেই ওর গলার কাছে জামাটা মুঠো করে চেপে ধরল। কাঁধে জখমের কথা ভেবে ফ্র্যান্সিস কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—আর বলবি? লোকটা ফ্র্যান্সিসকে ঝাঁকুনি দিল।

—কি?

—আমরা গাঁটকাটা।

—আমি সে কথা বলি নি।

—তবে রে! লোকটা ডান হাতের উলটাপিঠ ঘুরিয়ে ফ্র্যান্সিসের গালে মারল এক থাপ্পড়। অন্য লোকটি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল। ফ্র্যান্সিস আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। ওর নিজের গেল টাকা চুরি আবার উলটে ওকেই চোরের মার খেতে হচ্ছে। ফ্র্যান্সিস এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিল। তারপর লোকটা কিছু বোঝবার আগেই হাঁটু দিয়ে ওর পেটে মারল এক গুঁতো। লোকটা দু'হাতে

পেট চেপে বসে পড়ল। অন্য লোকটা এরকম কিছু একটা হতে পারে বোধ হয় ভাবতেই পারে নি। এবার সে তৎপর হল। ছুটে ফ্র্যান্সিসকে ধরতে এল। ফ্র্যান্সিস ওর চোয়াল লক্ষ্য করে সোজা ঘুষি চালাল। লোকটা চিৎ হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল। ফ্র্যান্সিস বুঝল—এর পরের ধাক্কা সামলানো মুশকিল হবে। কাজেই আর দেরি না করে এক ছুটে ঘরের বাইরে চলে এল। ভুরু মোটা লোকটাও ওর পেছনে ধাওয়া করল। ফ্র্যান্সিস ততক্ষণে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে হুড়কো তুলে দিয়েছে। বন্ধ দরজার ওপর দুমদাম লাথি

ফ্রান্সিস ওর চোয়াল লক্ষ্য করে সোজা ঘুষি চালাল।

পড়তে লাগল। ফ্র্যান্সিস আর দাঁড়াল না। দ্রুত পায়ে এতিমখানা থেকে বেরিয়ে এল।

এত বড় আমদাদ শহর। এত লোকজন, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, কোথায় খুঁজবে মকবুলকে। কিন্তু ফ্র্যান্সিস দমল না। যে করেই হোক মকবুলকে খুঁজে বের করতে হবে। সব আদায় করতে হবে। তারপর বন্দরে গিয়ে খোঁজ করতে হবে ইওরোপের দিকে কোন জাহাজ যাচ্ছে কিনা। জাহাজ পেলেই উঠে পড়বে। কিন্তু মকবুলকে না খুঁজে বের করতে পারলে কিছুই হবে না। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে না খেয়ে মরতে হবে।

সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াল ফ্র্যান্সিস। বাজার, বন্দর, অলিগলি কিছুই বাদ দিল না। কিন্তু কোথায় মকবুল? একজন লোককে তো মকবুল ভেবে ও উত্তেজনার মাথায় কাঁধে হাত রেখেছিল। লোকটা বিরক্ত মুখে ঘুরে দাঁড়াতে ফ্র্যান্সিসের ভুল ভাঙল। মাফটাফ চেয়ে সে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। উপোসী পেটে সারাদিন ওই ঘোরাঘুরি। দুপুরে অবশ্য এক ফালি তরমুজ চালাকি করে খেয়েছিল।

বাজারের মোড়ে একটা লোক তরমুজের ফালি বিক্রি করছিল। খিদেয় পেট

জ্বলছে। সেই সঙ্গে জলতেষ্টা। একফালি তরমুজ খেলে খিদেটাও চাপা পড়বে সেই সঙ্গে তেষ্টাটাও দূর হবে। কিন্তু দাম দেবে কোথেকে? অগত্যা চুরি। ফ্র্যান্সিস বুদ্ধি ঠাওরাল। রাস্তার ধারে এক দঙ্গল ছেলে খেলা করছিল। ফ্র্যান্সিস ছেলেগুলোকে ডাকল। ছেলেগুলো কাছে আসতে বলল—ঐ যে তরমুজওলাটাকে দেখছিস—ও কানে শুনতে পায় না। তোরা গিয়ে ওর সামনে বলতে থাক—"এক ফালি তরমুজ দাও—তাহলেই তুমি কানে শুনতে পাবে। লোকটা খুশী হয়ে ঠিক তোদের একফালি করে তরমুজ দেবে!"

ব্যস! ছেলের দঙ্গল হল্লা করতে করতে ছুটে গিয়ে তরমুজওলাকে ঘিরে ধরল। তারপর তারস্বরে চ্যাঁচাতে লাগল—"এক ফালি তরমুজ দাও—তাহলে তুমি কানে শুনতে পাবে।" তরমুজওলা পড়ল মহা বিপদে। আসলে ওর কানের কোন দোষ নেই। ও ভালই শুনতে পায়। ও হাত নেড়ে বারবার সে কথা বোঝাতে লাগল। কিন্তু ছেলেগুলো সে কথা শুনবে কেন?

তাদের চিৎকারে কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা। একদিকের ছেলেগুলোকে তাড়ায় তো অন্যদিকের ছেলেগুলো মাছির মত ভিড় করে আসে। আর সেই নামতা পড়ার মত চিৎকার। অতিষ্ঠ হয়ে তরমুজওলা ঝোলা কাঁধে নিয়ে অন্যদিকে চলল। ছেলের দলও চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে পিছু নিল, এবার ফ্র্যান্সিস এগিয়ে এল। তরমুজওলাকে ডেকে দাঁড় করাল, বলল—তোমার ঝোলায় সব চাইতে বড় যে তরমুজটা আছে বের কর। তরমুজওলা বেশ বড় একটা তরমুজ বের করল।

—এবার কেটে সবাইকে ভাগ করে দাও।

ছেলেরা তো তরমুজ খেতে পেয়ে ভেজায় খুশী। ফ্র্যান্সিসও একটা বড় টুকরো পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কামড় দিল, আঃ, কি মিষ্টি। হাপুস হুপুস করে খেয়ে ফেলল তরমুজের টুকরোটা। তরমুজঅলা এবার দাম চাইল। ফ্র্যান্সিস অবাক্ হবার ভঙ্গী করে বলল—বাঃ এই যে তুমি বললে কানে শুনতে পেলে সবাইকে তরমুজ খাওয়াবে।

—ও কথা আমি কখন বললাম।—তরমুজওলা অবাক্।

—এই তো তুমি কানে শুনতে পাচ্ছো।

ছেলেগুলো আবার চ্যাঁচাতে শুরু করল—কানে শুনতে পাচ্ছে—কানে শুনতে পাচ্ছে।

তরমুজওলা ছেলেদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসার আগেই ফ্র্যান্সিস বাজারের ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিল।

একফালি তরমুজে কি আর খিদে মেটে? তবু সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটাল। যদি ওর দুরবস্থার কথা শুনে কারো দয়া হয়, এই আশায় ফ্র্যান্সিস কয়েকটা খাবারের দোকানে

গেল। সব চুরি হয়ে যাওয়ার কথা বলল। অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউই ওকে বিশ্বাস করল না।

সন্ধ্যার সময় শাহীবাগের কোনার দিকে একটা পীরের দরগার কাছ এসে ফ্রান্সিস দাঁড়াল। একটু জিরোনো যাক। দরগার সিঁড়িতে বসল ফ্রান্সিস। ভেতরে নজর পড়তে দেখল অনেক গরিবদুঃখী সার দিয়ে বসে আছে। সবাইকে একটা করে পোড়া রুটি আর আলুসেদ্ধ দেওয়া হচ্ছে। তাই দেখে ফ্রান্সিসের খিদের জ্বালা বেড়ে গেল। সেও সারির মধ্যে বসে পড়ল। যে লোকটা রুটি দিচ্ছিল সে কিন্তু ফ্রান্সিসকে দেখে একটু অবাক্ই হল। খাবার দিল ঠিকই কিন্তু মন্তব্য করতেও ছাড়ল না—"অমন ঘোড়ার মত শরীর সুলতানের সৈন্যদলে নাম লেখাও গে যাও।" ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। মুখ নীচু করে পোড়া রুটি চিবুতে লাগল। হঠাৎ দেশের কথা, বাড়ির কথা, মার কথা মনে হল। কোথায় এই অন্ধকার খোলা উঠোনে ভিখিরীদের সঙ্গে বসে পোড়া রুটি আলুসেদ্ধ খাওয়া আর কোথায় ওদের সেই ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত খাওয়ার ঘর, ফুলের কাজকরা সাদা টেবিল ঢাকনা, ঝকঝকে পরিষ্কার কাঁটা চামচ, বাসনপত্র। খাওয়ার জিনিসও কত। কত বিচিত্র স্বাদ সে-সবের। সেই সঙ্গে মার সস্নেহ হাসিমুখ—ফ্র্যান্সিসের চোখে জল এসে গেল। ফ্র্যান্সিস চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়াল। না—না—এসব ভাবনা মনকে দুর্বল করে দেয়। এসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। বাড়ির নিশ্চিন্ত বিলাসী জীবনের নাম জীবন নয়। জীবন রয়েছে বাইরে—অন্ধকার ঝড়-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে, আগুন-ঝরা মরুভূমিতে, তরবারির ঝকমকানিতে, দেশবিদেশের মানুষের স্নেহ ভালবাসার মধ্যে।

তখনও রাত বেশী হয় নি। ফ্র্যান্সিস এতিমখানায় এসে ঢুকল। খুঁজে খুঁজে নিজের ঘরটার দিকে এগোল। সেই লোক দুটো কি আর আছে? ব্যবসায়ী লোক —হয় তো এক রাত্রির জন্য আশ্রয় নিয়েছিল। সকালে নিশ্চয়ই দরজায় ধাক্কাধাক্কি লাথি মারার শব্দে আশেপাশের ঘরের লোক এসে দরজা খুলে দিয়েছে। তারপর দুপুর নাগাদ পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেছে।

দরজাটা বন্ধ। ফ্র্যান্সিস নিশ্চিন্ত মনেই দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে গেল। এই সেরেছে। সেই মূর্তিমান দুজনেরই একজন যে। মোটা ভুরু নাচিয়ে লোকটা ডাকল —এসো ভেতরে। ফ্র্যান্সিস নড়ল না। লোকটা এবার হেসে ফ্র্যান্সিসের কাঁধে হাত রাখতে গেল। ফ্র্যান্সিস এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিল। ঘরে চোখ পড়তে দেখল অন্য লোকটাও রয়েছে।

—তোমার এখনও রাগ পড়েনি দেখছি। লোকটা হাসল।

ফ্র্যান্সিস ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—বিশ্বাস করো ভাই—সকালে তোমার সঙ্গে আমরা যে ব্যবহার করেছি তার জন্যে আমরা দুঃখিত।

ফ্র্যান্সিস তবু নড়ল না।

—ঠিক আছে—তুমি ভেতরে এসো। যদি মাফ চাইতে বলো—আমরা তাও চাইবো।

ফ্র্যান্সিস আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। লোকটা দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হতেই ফ্র্যান্সিস ঘুরে দাঁড়াল।

—দরজা বন্ধ করতে পারবে না।

—বেশ। লোকটা হেসে দরজা খোলা রেখেই ওর কাছে এগিয়ে এল। বলল—এবার বিছানায় বসো।

ফ্র্যান্সিস নিজের বিছানায় গিয়ে বসল।

অন্য লোকটি তখন একটা পাত্র হাতে এগিয়ে এল। পাত্রটা ফ্র্যান্সিসের সামনে রেখে বলল—

—খাও। সারাদিন তো তরমুজের একটা ফালি ছাড়া কিছুই জোটেনি।

ফ্র্যান্সিস বেশ অবাক্ হল। এই লোকটা জানল কী করে ?

মোটা ভুরুঅলা লোকটি এবার বলল—

—তুমি ঠিকই ধরেছো। মকবুল আমাদের খুবই পরিচিত। ওকে আমরা ভালো করেই জানি। গাঁট কাটার মত নোংরা কাজ ওর পক্ষে করা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের উলটে তোমাকেই সন্দেহ হয়েছিল।

—আমাকে ?

—হ্যাঁ। তাই দুপুরবেলা আমরা দুজন তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। পেলামও তোমাকে। বাজারের মোড়ে তুমি তখন তরমুজ চুরি করছিলে।

ফ্র্যান্সিস হাসল।

—খুব বেঁচে গেছো। তুমিও গা ঢাকা দিলে আর ঠিক তক্ষুণি সুলতানের পাহারাদার এল। অবশ্য তোমার কোন বিপদ হলে আমরাও তৈরী ছিলাম তোমাকে বাঁচাবার জন্যে।

—তাহলে তো তোমরা সবই দেখেছো। ফ্র্যান্সিস বলল।

—হ্যাঁ তখনি বুঝলাম—তুমি মিথ্যে বলোনি। সত্যি তোমার সব চুরি হয়েছে—নইলে ওরকম চুরির ফন্দী আঁটে। খাও ভাই—এবার হাত চালাও—খেয়ে নাও আগে।

ফ্র্যান্সিস আর কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে খেতে লাগল। পরোটা, মাংস, উটের দুধ দিয়ে তৈরী মিষ্টি—চেটেপুটে খেয়ে নিল সব।

এবার মোটা ভুরুঅলা লোকটা বলল—

—শোন ভাই—আমার নাম হাসান। কাল সকালেই আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আমরাও খোঁজে থাকব—মকবুলের দেখা পেলেই সব আদায় করে লোক মারফৎ তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তুমি তো এখানেই থাকবে?

—হ্যাঁ—যতদিন না জাহাজের ভাড়া যোগাড় করতে পারি।

—বেশ। এবার তাহলে ঘুমোও—অনেক রাত হল।

ফ্র্যান্সিসও আর জেগে থাকতে পারছিল না—পরদিন কি খাবে, কী ভাবে জাহাজের ভাড়া সংগ্রহ করবে—এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। [ক্রমশঃ]

ছেলে মাথায় ওঠে

রিপ্লে থেকে

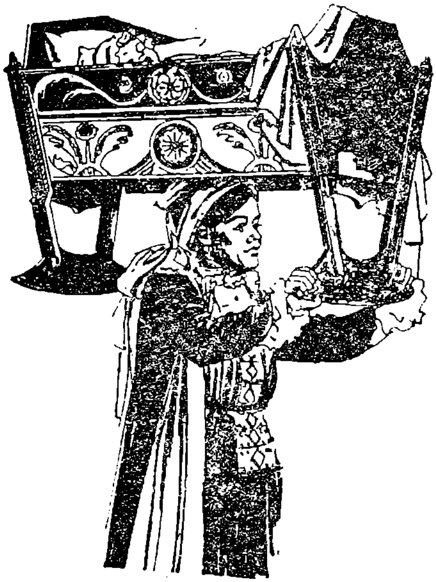

ছেলে-মেয়ে ছোট থাকলে তাদের কোলে নিয়ে থাকতে হয়। কোথাও যেতে আসতে হলে কোলে করে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু পাহাড় অঞ্চলে দেখা যায় সেখানকার মেয়েরা ছেলে-মেয়েদের কোলে করে না নিয়ে মাথায় একটা ফেট্টি লাগিয়ে পেছনের থলিতে ছেলেকে বসিয়ে পথ অতিক্রম করে। রাস্তায় রাস্তায় যেসব বেদেনী মেয়েরা গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায় তারা ছেলেকে একটা পুঁটলিতে ভরে পুঁটলিটার দুপাশে কাঠের লাঠিতে দড়ি বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু ছেলেকে মাথায় করে নিয়ে যায় শুধু এক জায়গায়। সেটা ইটালীর পিমণ্টো পার্বত্য অঞ্চলে। সেখানকার মায়েরা দোলা খাটে ছেলেকে শুইয়ে খাটটি মাথায় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে যায়। একটুও ক্লান্ত হয় না। হয় তো ছেলের দিকে মনটা পড়ে থাকে বলে নিজের পরিশ্রমের কথা তার মনে পড়ে না।

হাঁদা-ভোঁদার
ফুটবল ম্যাচ
পারিস যদি আটকা!
দারুন সট! এই নিয়ে তিনজন গোলকীপারকে ঘায়েল করলো হাঁদা! ওকে দলে নিলে ভোঁদার দলকে আজ ম্যাচে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দেবো!
অ হলে ঐ কথাই রইলো, তুই আমাদের হয়ে খেলছিস।
ঠিক আছে, বিকেলে ম্যাচের সময় দেখা হবে!
বিকালে
হাঁদা, কোথাও যাবি না। গাড়ি করে তোকে নিয়ে তোর মামাবাড়ি যাবো!
কিন্তু বাবা, আমি যে বল খেলতে যাচ্ছি!
গাড়িতে ওঠ বলছি হাঁদা!
আচ্ছা উঠছি!
হঠাৎ
যাঃ! গাড়ির চাকা ফুটো হয়ে গেলো!
হিঃ হিঃ! চমৎকার!
দুম!
তোকে সঙ্গে আনাতে খুব কাজ হয়েছে! তুই ঠেলে আধমাইল সামনের গ্যারেজটায় নিয়ে চল। আমি স্টিয়ারিংএ আছি।
উফ! আফ!
দুটো চাকাই ড্যামেজ! কাল নিয়ে যাবেন।

গাড়ি ঠেলে খুব হাঁপিয়ে গেছিস! তুই বাড়ি চলে যা, আমি একটু ঘুরে আসি।
সেই ভালো!
এই যে হাঁদা! এতো দেরী! আমরা তো খেলা শুরু করে দিচ্ছিলাম!
ওফ, ওফ! দাঁড়া, বুটটা পরে আসি।
তোদের খেলোয়াড় খেলবার আগেই যে হাঁপাচ্ছে রে!
ওফ্! এবার কিক্ অফ— হাঁপিয়ে না পড়লে—
আফ্‌সস্! ফস্কে গেলুম!
আরেক বার লাথি মারি!
ওফ্! স্যাণ্ডউইচ হয়ে গেলুম!
খেলা শেষে
ওরে মা রে! আমি মামা বাড়ি যাবো!
তোকে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি অপদার্থ কোথাকার!

সব্যসাচী

৬

ভ্যালথর ওদিকে নিরাপদেই পার হয়েছে নদী। ডাঙ্গায় উঠে সে প্রতীক্ষায় আছে টারজানের। সঙ্গে সঙ্গেই ত আসছিল সে? কত দেরি আর হতে পারে তার? এল বলে টারজান! ঐ বুঝি এল!

নাঃ, প্রতীক্ষা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। নিস্ফল প্রতীক্ষা। তবে কি বিপদ ঘটল কিছু? ভ্যালথর চ্যাঁচাতে লাগল টারজানের নাম ধরে। নেই কোন উত্তর। তাহলে কি টারজান ওপারেই ফিরে গেল পেরুতে না পেরে? তা যদি গিয়ে থাকে, নদীতে যে প্রচণ্ড জলকল্লোল আজ, এপারের চিৎকার সে কখনোই শুনতে পাবে না।

ভ্যালথর অগত্যা মনস্থ করল—রাত-ভোর সে বসে থাকবে এখানে সাথীর জন্য। এই অজানা দেশে ওকে ভ্যালথরই এনে ফেলেছে। অজানা ও বিপজ্জনক। এখন তাকে পিছনে ফেলে নিজের শহরে নিজে ফিরে যাওয়া? সেটা হবে চরম স্বার্থপরতার কাজ। টারজান তার প্রাণদাতা। এমন অকৃতজ্ঞ ব্যবহার ভ্যালথর করতে পারে না তার সঙ্গে। দিনের আলো যতক্ষণ না ফুটছে, সে বসে থাকবে এখানে। যদিও দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে।

বেড়ে যাবে, কারণ ক্যাথনি তার শত্রুপুরী। সে যে অ্যাথনির লোক, তা ত তার গায়ের হস্তীদন্ত বর্ম থেকেই প্রকাশ। ক্যাথনির যে কোন লোক তাকে দেখতে পেলেই গোটাকতক সিংহ লেলিয়ে দেবে তার উপরে। হয় সে সিংহের উদরে যাবে, নয়ত ধরা পড়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে। পরে বিচার হবে তার। দণ্ডাজ্ঞা যা হবে, তা জানাই আছে ভ্যালথরের। "লোকটাকে সিংহের মুখে ফেলে দাও।"

এতখানি বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও যে ভ্যালথর নদীর ধারে বসে রইল প্রভাত পর্যন্ত, এতে তার চরিত্রগৌরবই পরিস্ফুট। কিন্তু সে ঝুঁকি নিয়েও ফল কিছু হল না। ওপার ত ঐ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কোথাও কোন চিহ্ন নেই টারজানের। ওপারেও না, এপারেও না। তাহলে ত নিশ্চয়ই জলের তোড়ে ভেসেই গিয়েছে সে! ভ্যালথর মর্মবেদনায় কপালে করাঘাত করল কয়েকবার।

কিন্তু আর এখানে থেকে ফল নেই কিছু। ফল ত নেই-ই, আছে বিপদ। অগত্যা ভ্যালথর শহীদ-গিরিসংকটের দিকে পা চালিয়ে দিল। চলতে চায় না পা, তবু চালাতে হল তাকে। নিজের একখানা হাত কেটে দিলেও যদি বন্ধুকে ফিরে পাওয়া যেত, সেই মুহূর্তেই সানন্দে তা দিয়ে দিত ভ্যালথর।

পথের পরিচয়, পথেই বুঝি তার শেষ। আর কি জীবনে দেখা হবে এই দু'জনের!

টারজান ওদিকে ভেসে চলেছে।

তরঙ্গ-তাড়নে কখনও একূলে এসে পড়ছে টারজান, কখনও চলে যাচ্ছে ওপারে। নিজে সে লড়াই করার চেষ্টা করছে না স্রোতের বা ঢেউয়ের সঙ্গে। ভেসে থাকতে পারলেই সে তুষ্ট আপাততঃ। কূলে ওঠা? এই স্রোতেরই খামখেয়াল হয়ত একসময় তাকে ঠেলে তুলে দেবে ডাঙ্গায়।

হঠাৎ কিন্তু একটা কথা মনে পড়ে গিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে উঠল টারজান। কথাটা ভ্যালথরের কাছেই শোনা। কয়েক মাইল ভাটিতে নদীর দুটো পাড় চেপে এসেছে দারুণ রকম। দু'পাড়েই পাহাড় সেখানে। সেই সংকীর্ণ খাতের ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে ছুটে গিয়ে নদীটা আবার হঠাৎ একটা ঝাঁপ খেয়েছে প্রায় হাজার ফুট নীচে। বিকট একটা মরণ-ফাঁদ ঐ জলপ্রপাত। পড়লে আর নিস্তার নেই জ্যান্ত প্রাণীর। হাড়গোড় গুঁড়িয়ে ত যাবেই, দেহের মাংসপিণ্ডটা কত দূরে কোথায় গিয়ে ভেসে উঠবে, এ দেশের কারও সেদিকে কোন ধারণাই নেই।

ভেসে যাচ্ছে টারজান। অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। কখন কোন্ কূল থেকে কতদূরে সে আছে, কিছুই আন্দাজ করতে পারছে না। একই চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু—কত দূরে সেই জলপ্রপাত? যে-বেগে সে ভেসে যাচ্ছে, তাতে আর খুব বেশী দূর বোধহয় নয়। প্রাণটা বাঁচাবার জন্য কোন চেষ্টা যদি করতে হয়, তবে তা এই বেলা। সময় আর হাতে বেশী নেই।

কিন্তু কী চেষ্টাই বা সে করতে পারে, যেখানে দুর্জয় স্রোত তৃণগাছির মতই তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিয়তির মুখে?

দৈবের উপরে বিশ্বাস কোনদিনই নেই টারজানের। বরাবর পুরুষকারে বিশ্বাসী সে।

টারজান ঝুলে আছে সেই জিনিসটাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে।

পুরুষকারের সাধনাতেই সিদ্ধ পুরুষ। আজ কিন্তু অযাচিত-ভাবে সেই অনাদৃত দৈবই বাঁচার পথ করে দিল টারজানের।

ভেসে যেতে যেতে হঠাৎ কী একটা হাতে ঠেকল টারজানের —গোল অথচ লম্বাটে। পিচ্ছিল অথচ কাঁটাওয়ালা।

কী এটা হতে পারে, চিন্তা করবার জন্য অপেক্ষা সে করল না, জাপটে চেপে ধরল সেই লম্বাটে বস্তুটাকে।

আর, তাজ্জব ব্যাপার বলতে হবে। চেপে ধরা মাত্র সেই লম্বাটে পিচ্ছিল জিনিসটা সড়াক করে উঁচু হয়ে উঠল জলের উপরে। একটু আধটু নয়, অন্ততঃ দশ-বারো ফুট উঁচু হয়ে সাঁ সাঁ শব্দে একটা চক্কোর দিল হাওয়ায়। টারজান ঝুলে আছে সেই জিনিসটাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে। বনবন করে সেও ঘুরছে ওটার সঙ্গে।

একটা প্রচণ্ড ঝটকা অতঃপর। সেই লম্বাটে জিনিসটা থেকে দু'হাতের মুঠি খুলে গেল টারজানের। আর সে বিপুল বেগে ছিটকে চলে গেল হাওয়ার ভিতর দিয়ে। পড়ল যখন—

একটা উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে পড়ল টারজানের কণ্ঠ থেকে। পড়েছে সে শক্ত ডাঙ্গারই উপরে। পাথুরে মাটিতে অনেক উপর থেকে আছাড় খেলে যে বেদনা মানুষের লেগে থাকে, তা অবশ্যই টারজানের লেগেছে। কিন্তু সে কথা কে ভাবে তখন? আসন্ন মৃত্যুর গ্রাসকে সে ফাঁকি দিতে পেরেছে, এই আনন্দেই সে মশগুল।

কিন্তু ফাঁকি দিল কার কৃপায়? টারজান সব জীবজন্তুকেই জানে। স্থলচর, জলচর, খেচর কারও স্বভাবই অজ্ঞাত নয় ওর কাছে। এ অদৃশ্য পরিত্রাতা আর কেউ নয়, কোন জলতল বিহারী মহাকুমির। তার লেজটাকেই টারজান চেপে ধরেছিল। লেজেরই ঝটকায় সে ডাঙ্গায় এসে পড়েছে, উত্তাল নদীবক্ষের বিশ ফুট উপর দিয়ে উড়ে। ভগবান? ইংলণ্ডে

বাসকালে গির্জায় সে গিয়েছে। সামাজিক কর্তব্যবোধেই গিয়েছে, দেশব্যাপী সার্বজনীন সংস্কারকে মর্যাদা দেবার জন্যই। অন্তরের প্রেরণাও ছিল না তার মধ্যে। ভগবৎ-সত্তা সম্বন্ধে চেতনাও তার জাগ্রত হয় নি সেই উপাসনার দরুন। কিন্তু আজ ?

জীবনে এই প্রথম মনে হল টারজানের—ভগবান হয়ত সত্যিই আছেন। আছেন, এবং অহেতুক করুণাই তিনি করে থাকেন পাত্রাপাত্র বিচার না করে।

যাহোক, টারজান নদী থেকে উঠেছে। যে-পারে যেতে চাইছিল, উঠেছে সেই পারেই। তবে যে পারঘাটাতে সে আর ভ্যালথর নেমেছিল এক সাথে, ডাঙ্গায় উঠেছে তা থেকে বেশ কয়েক মাইল ভাটিতে। জায়গাটা যে কী ও কেমন, তা টারজান কিছুই জানে না। ভ্যালথর সঙ্গে থাকলে বলতে পারত অবশ্য।

ভ্যালথর গেল কোথায় ? সেও ভেসে গেল না কি জলের তোড়ে ? কুমিরের লেজ ধরে সে ডাঙ্গায় উঠবে, এমন আশা টারজান করতে পারে না, স্রোতের মুখে যদি পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে প্রাণ বাঁচানো তার পক্ষে সম্ভব নাও হয়ে থাকতে পারে। যাই কেন ঘটে থাকুক না, সেটা খোঁজ নিয়ে জানতে হবে টারজানকে। সে নদীর কূল ধরে উজানের দিকে অগ্রসর হল। এই আশা নিয়ে এগুল যে নিরাপদেই নদী পার হয়েছে ভ্যালথর এবং হয়ত টারজানের জন্যই প্রতীক্ষা করছে নদীর ধারে কোথাও।

এ অনুমান যে তার ভুল ছিল না, তা ত আকাশের ঐ দুষ্টু চাঁদ জানে। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সে ত সবই দেখেছে ! দেখেছে যে টারজান যখন ডাঙ্গায় উঠল, ভ্যালথরও তখন ডাঙ্গাতেই রয়েছে, নদীর একই তীরে, মাত্র কয়েক মাইলের ব্যবধানে। উজান ধরে টারজান যদি সত্যিই এগুতে পারত, হয়ত দেখা হয়েই যেত দুই সাথীতে।

কিন্তু সেটা অভিপ্রেত ছিল না ভবিতব্যের। হাঁটা শুরু করতেই সে একটা আলো দেখতে পেল। জানালার ভিতর দিয়ে আসছে কোন ঘরের আলো। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক শুনতে পেল কয়েকটা সিংহের। হ্যাঁ শুনতে আশ্চর্য লাগলে কী হবে, কয়েকটা সিংহ একসাথেই গর্জন করে উঠল ক্রুদ্ধভাবে। তাদের সে মিলিত হুঙ্কারে নৈশ নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল যেন।

টারজানের মনে পড়ে গেল ভ্যালথরের কথা। ক্যাথনির অধিবাসীরা সিংহ পোষে। নদীর ধারের বিশাল সমতল ক্ষেত্রটার নামই নাকি সিংহের মাঠ। ঐ যে চার পাঁচটা সিংহের ডাকও শোনা যাচ্ছে। ওরা নিশ্চই সেই গৃহপালিত-শ্রেণীর সিংহ, বনচর ন্যুমার স্বজাতি হলেও যারা স্বগোত্র নয়। যাকগে, থাকুক ওরা ওদের পাঁচিলের ভিতর। টারজানের প্রয়োজন নেই ওদের ঘাঁটাবার। অবশ্য ওরা যদি ঘাঁটায় টারজানকে, সে হবে অন্য কথা। তার যথোচিত ব্যবস্থাও টারজান করবে তখন।

টারজান একবার কাঁধে হাত দিল। নদীর বুকে ঢেউয়ের অত হুটোপাটি সত্ত্বেও বেঁটে ধনুক আর তীর ভর্তি তূণীর এখনও বাঁধাই আছে কাঁধে। বল্লমখানা হাতে ছিল, সেটা ভেসে গিয়েছে। আর গিয়েছে ঘাসের দড়িগাছা। কটিতে সেটি জড়ানো ছিল সিংহচর্মের কৌপিনের উপরে। কৌপিন আছে বটে কোনমতে, কিন্তু দড়িগাছা নেই।

না, ওদের সম্বন্ধে কোন কৌতূহল টারজানের আপাততঃ নেই। বরং তাড়া আছে ভ্যালথরকে খুঁজে বার করবার। নিঃশব্দ পদক্ষেপে বাড়িটার পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া তার মতলব।

কিন্তু ওরা যে নাছোড়বান্দা! গর্জনের উপরে গর্জন! বিরাট লাফ দিয়ে একটা সিংহ পাঁচিল টপকে এপিঠে এসে পড়ল। টারজানের থেকে মাত্র পনেরো বিশ ফুট দূরে। স্পষ্টতঃই যুদ্ধং দেহি ভাব তার।

টারজান জানে যে পাঁচিলের ওপিঠে সিংহ আরও বেশ কয়েকটা আছে। তারাও অবশ্যই এ-যুদ্ধের শরিক হবার জন্য আগ্রহী। এল বলে তারাও। এলে—পাঁচটা সিংহের সঙ্গে একা লড়াই দেওয়া, জীবন-মরণের ব্যাপার হয়ে উঠবে নিশ্চয়। তার চেয়ে, এখনও যখন আসে নি তারা—

কাঁধ থেকে ধনুক নিয়ে তাতে তীর জুড়ল টারজান। টং করে শব্দ হল একটা। পরক্ষণেই ভীম গর্জনে নৈশ আকাশ কাঁপিয়ে সিংহটা উলটে পড়ল। মোক্ষম আঘাত লেগেছে তার। নইলে গর্জনটা ও রকম আর্তনাদের মত শোনাত না। এই অবসর তাহলে টারজানের। আহত সিংহ কিছুতেই আর পশ্চাদ্ধাবনে সক্ষম হবে না তার। হয়ও যদি, তার গতি হবে মন্থর। ততক্ষণে তীরবেগে দৌড়োলে—

কিন্তু তার সময় পাওয়া গেল কই? আবার ক্রুদ্ধ গজন, পর পর দুটো সিংহ এসে পড়ল পাঁচিলের ওপিঠে। ভিতরেও সিংহ গজনের সাথে মিশে যাচ্ছে বহু মনুষ্যকণ্ঠের ক্রুদ্ধ তর্জন। ভ্যালথরের সাহচর্য করে করে থেনার-অন্থারের ভাষা যেটুকু আয়ত্ত করেছে টারজান ইতিমধ্যে, তাতে তার এইটুকু বোধগম্য হল যে মানুষগুলোর মনে ক্রোধ যতটা হয়েছে, বিস্ময় জেগেছে তার চেয়ে অনেক বেশী। একটা কথা সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, তা হল এই—"রানীর সিংহের গায়ে হাতিয়ার চালায়, কে সে দুর্বৃত্ত? এমন ধৃষ্টতা তার কোথা থেকে হয়?"

রানীর সিংহ? তা হলে কি রানীরই বাড়ি এটা? হ্যাঁ, ভ্যালথরের কথা মনে পড়ে বটে। অন্থারের রাজদণ্ড পরিচালনার অধিকার এখন যাঁর হাতে ন্যস্ত, তিনি কোন রাজা নন, তিনি রানী।

কিন্তু রাজা হোন আর রানী হোন, এ-বাড়ি তাঁর কেমন করে হয়? শহর যে এটা

ভীম গর্জনে নৈশ আকাশ কাঁপিয়ে সিংহটা উলটে পড়ল। [পৃষ্ঠা ৫৯৮

নয়, এ ত জাজ্জ্বল্যমান সত্য। নদীর ধারে মাঠের মাঝে বিচ্ছিন্ন পুরী একটা। খুব বড় এটা হতেও পারে। পিছন দিকে এর বিস্তার বহুদূরব্যাপী যদি হয়, তাতে অবাক্ হবার কিছু নেই। কিন্তু এর ধারে কাছে লোকালয় নেই যে, সে বিষয়ে টারজান নিঃসন্দেহ। মানুষের বাড়িতে আলো থাকে, এখানে এই বাড়ির একটা বাতায়নে ছাড়া কোথাও কোন আলো নেই। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার চারদিকে।

তা ছাড়া, তেপান্তর মাঠের ভিতর কখনও রাজবাড়ি হয় কি? হয় শুধু রূপকথার রাজ্যে। কিন্তু ঝড় বৃষ্টি বন্যার তাণ্ডব, আর প্রথমে কুমির তারপরে সিংহের প্রাদুর্ভাব যেখানে এমন সুপ্রকট, সে-দেশকে রূপকথার রাজ্য বলে স্বীকার করে নেওয়া টারজানের মত প্রকৃতির শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে রানীর সিংহের গায়ে হাতিয়ার তোলার কথা উঠেছে বটে ঐ পাঁচিলের আড়ালে। অর্থাৎ এখানকার সিংহগুলো রানীরই সিংহ। তা হতে পারে। এ-বাড়িটা সিংহের খোঁয়াড় হতে পারে রানীর।

ভাবছে আর দৌড়োচ্ছে টারজান। তার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োচ্ছে আবার পাঁচ পাঁচটা সিংহ। আহত পশুরাজ অবশ্য গড়াগড়িই খাচ্ছেন মাটিতে, কিন্তু ওধার থেকে সদ্য আমদানি পাঁচটা জানোয়ার বিকট গর্জনে ধাবিত হয়েছে দংষ্ট্রা বিকাশ করে। তাদের পিছনে আসছে একদল মানুষও। কেমন চেহারা তাদের, কী জাতীয় হাতিয়ার তাদের হাতে। সর্বোপরি সংখ্যা তাদের কত, দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ আর গোনাগুন্তি করার সময় নেই টারজানের। কোলাহল থেকেই মানুষ আর জন্তুর একত্র সমাবেশ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে সে দৌড়ালো প্রাণপণে। একটা সুবিধামত স্থান তার পাওয়া দরকার। এমন স্থান, যেখানে দাঁড়িয়ে তীরন্দাজির ষোল আনা সার্থকতা সে আদায় করতে পারে। অর্ধেক চাঁদটা আবার দেখা দিয়েছে আকাশে। লক্ষ্যভেদে অসুবিধা কিছু হবে না।

কিন্তু কই, সে-রকম জায়গা ত চোখে পড়ে না মোটেই। এই সমতল প্রান্তরে দাঁড়িয়েই কি তাহলে লড়তে হবে টারজানকে? সে-লড়াইয়ের পরিণতি মর্মান্তিক হতে বাধ্য। চোখের পলকে দ্বিপদ ও চতুষ্পদ দুশমনে বেষ্টিত হয়ে পড়বে টারজান। তীরধনুকমাত্র সম্বল করে কতক্ষণ সে আত্মরক্ষা করতে পারবে?

আবার সেই নদী! উত্তাল তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ ভয়ংকরী! এতক্ষণ টারজানের ডাইনে অন্ততঃ পঞ্চাশ ফুট তফাতে ছিল নদীর প্রবাহ। হঠাৎ দেখে যে নদীপ্রবাহ ঘুরে এসে তার অগ্রগতির পথই বন্ধ করে ফেলেছে। বাঁক যেটা নিয়েছে, তাকে সমকোণের প্রায় কাছাকাছিই বলা যেতে পারে। আর দৌড়োতে হলে টারজানকে ঘুরে যেতে হবে বাঁ দিকে। অথচ—

সিংহেরা এবং সিংহের রাখালেরা জানে ত নদীর এই বাঁকের কথা! তাদের কতক আগে থেকেই কোনাকুনি পার হয়ে আসছে প্রান্তর। ফল?

ত্রিভুজের দুটো বাহু একত্রে তৃতীয় বাহুর চেয়ে বৃহত্তর হতে বাধ্য। সেই হিসাবে ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে কোনাকুনি ধাবমান সিংহেরা এবং সিংহরক্ষকেরা টারজানের আগেই প্রান্তরের ওপাশে নদীর কূলে ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারবে। পালাবার পথ আর থাকবে না টারজানের। সমুখে এবং পিছনে—দু'দিকেই তখন মরণ করবে মুখব্যাদান। অপরাজেয় বনের রাজার জীবন-নাট্যে নেমে আসবে সমাপ্তির কৃষ্ণ যবনিকা।

টারজান দৌড় থামায় নি, কিন্তু ভীষণভাবে ভাবছে দৌড়োতে দৌড়োতেই। ভাবছে আগু-পিছু দু'দিকে শত্রুকে রুখতে যাওয়া একা মানুষের পক্ষে যখন নিতান্তই অসম্ভব, তখন তার করণীয় একটাই আছে এক্ষেত্রে। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া। ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্বিতীয়বার ভেসে যাওয়া। সেবারের চেয়ে এবারে সুবিধা আছে এইটুকু যে তখন ছিল ঘোর অন্ধকার, এখন ফিকে মতন জ্যোৎস্না উঠেছে খানিকটা। দেখে শুনে সাঁতার দেওয়া যেতে পারবে।

সাঁতার? স্রোত ত এখনো তেমনি প্রচণ্ড! আবার ত তা টারজানকে দুর্নিবার বেগে ঠেলে নিয়ে যাবে সেই কুখ্যাত জলপ্রপাতের দিকে। সেদিকেও ত অবধারিত মৃত্যু।

কিন্তু মরতে গিয়েও সেবার বেঁচে গিয়েছিল টারজান, কল্পনাতীত উপায়ে। কুমিরের লেজ ধরে। এবারেও যে সেইরকমই একটা কিছু ব্যাপার ঘটবে না, তা কে বলতে পারে? দিই ত ঝাঁপ।

ঝাঁপ দেবার মুখেই একটা আশ্চর্য আবিষ্কার! সে আবিষ্কারে বুকের সাহস দ্বিগুণ বেড়ে উঠল টারজানের। লাফ যেখানে দেবার মতলব করেছে সে, সেইখানেই কূল থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে একটা মস্ত পাথরের চাঙড়। এখন কোন রকমে নাক জাগিয়ে আছে বটে জলের উপরে, কিন্তু নদীর স্বাভাবিক অবস্থায় জল থেকে তার মাথা যে অন্ততঃ দশ বারো ফুট উঁচুতে থাকে, তাতে সন্দেহ নেই। আথাল-পাথাল ঢেউয়ের দরুন দূর

থেকে সে পাথরখানা দেখতে পায় নি, এবার দেখামাত্রই বিপুল উৎসাহে সে দিল এক দানবীয় লম্ফ।

ত্রিশ ফুট লাফ টারজানের পক্ষে এমন বেশী কিছু নয়। অনেক সময়ই তাকে তা দিতে হয়েছে। তাও ফাঁকা হাওয়ার রাজ্যে। মধ্য আফ্রিকার মহারণ্যে, সৃষ্টির আদিকাল থেকে যেখানে মানুষের পা পড়ে নি মাটিতে, সেখানকার মহামহীরুহদের চারতলার ডালে ডালে ছুটতে ছুটতে দূর দূরান্তরে ধাওয়া করা টারজানের নিত্য বিলাস। সেই প্রমত্ত পর্যটনের মুখে এমনটাও কখনো কখনো ঘটেছে যে পায়ের নীচের ডালখানা থেকে অন্য বৃক্ষের নিকটতম ডালের দূরত্ব, দেখা গিয়েছে ত্রিশ ফুট বা তারও বেশী। তেমন ক্ষেত্রে কি পরিক্রমা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে টারজান? কখনোই না। অকুতোভয়ে দিয়েছে লাফ, শৈশবের পালকপিতা মহাকপি কালচূরকে স্মরণ করে। নিরাপদে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে বৃক্ষান্তরের শাখায়।

ধরতে গেলে সে-সব লাফের তুলনায় আজকে এই উদ্যম অনেক সোজা। সে-লাফ ব্যর্থ হলে পড়তে হত ফাঁকা হাওয়ার ভিতর দিয়ে চারশো ফুট নীচের মাটিতে। হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে। আজ কিন্তু এই যে লাফ, এটা যদি তাকে নদীর বুকের ঐ টিলার মাথায় পৌঁছে দিতে না-ও পারে, ততখানি মারাত্মক এটা কখনোই হতে পারবে না। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মরবে না নিশ্চয়ই। কারণ পড়লে সে নদীর জলেই পড়বে। আর জলের ভিতর দুর্জয় তরঙ্গমালার সঙ্গে যুদ্ধ করেও যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জীবন রক্ষা করা সম্ভব, তা ত টারজান হাতে কলমেই দেখিয়েছে।

খুব বেশী মন্দ ভাগ্য যদি হয়, সেই অভিজ্ঞতাটাই আর একবার হবে। এখানে সিংহের খোরাক হওয়ার চেয়ে সেটা অনেক ভাল।

সুতরাং পালকপিতা কালচূর কপিকে স্মরণ করে আজ আবার দিল এক দুঃসাহসিক লাফ টারজান। এবং অক্লেশে গিয়ে অবতীর্ণ হল পাথর দ্বীপের মাথায়। ঢেউ ভাঙ্গছে তার কোমর সমানে উঁচু হয়ে এক একবার। পরক্ষণেই নেমে যাচ্ছে সে জল নদীর বুকে। টারজান নিরাপদ আপাততঃ।

নদীর কূলে তখন বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে এক সারি প্রাণী। গোটা পাঁচ ছয় সিংহ সে দলে, আর জনা দশেক মানুষ। তাদের হাতে অস্ত্র বলতে এক ধরনের মুগুর আর এক জাতীয় বল্লম। নদীর কূলে ওরা, আর নদীর বুকে টারজান। দুই শত্রুর মাঝখানে গর্জমান নদীস্রোতে উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস। টারজান তূণ থেকে তীর নিয়ে ধনুকে জুড়ল। (ক্রমশঃ)

"৺মণি ধর স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়

প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

জীবন্ত মাটির মূর্তি

অজিতকুমার সু

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। সে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ।

অজ পাড়াগাঁ কামারপুকুর। চারদিকে ঝোপঝাড় জঙ্গল—ধুধু মাঠ—মহাশ্মশান!

গাঁয়ের শেষ ঘর ক্ষুদিরাম চাটুজ্যেদের। তারপরই ডাঙ্গা, মাঠ, শ্মশান, ভূতির খাল, মানিক রাজার আমবাগান, ঝোপঝাড় ইত্যাদি।

বাড়ির পাশ দিয়েই রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে সাধুসন্ন্যাসীদের পুরী যাওয়ার পথ। যেতে যেতে চাটুজ্যেদের বৈঠকখানায় বিশ্রাম করে যান ঐ সব সন্ন্যাসীর দল। তাঁদের সান্নিধ্য ক্ষুদিরাম চাটুজ্যের ছোট ছেলে গদাধরকে বড় আনমনা করে দেয়। হয়তো তাঁদের সঙ্গেই পাশের পথ দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যায় ভাবুক কিশোর। ঐ পথেই গাঁয়ের মেয়েরা আনুড়ের জাগ্রতা দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে মাকুড়ীসপ্তমীর দিন যখন পূজো দিতে যায় তখন তাদের সঙ্গেই চলে যায় গদাধরও। বিশালাক্ষীর মন্দির তাকে বড় আকর্ষণ করে। নির্জন গাঁয়ের মাঠে মাঠে ঝোপের আড়ালে সে প্রায়ই ঘুরে বেড়ায়। বুধুই মোড়লের শ্মশানে, ভূতির খালের পাশের মহাশ্মশানে, বটতলায়, বেলতলায় চোখ বুজে বসে থাকে। সেই নিরিবিলি অজ পাড়াগাঁয়ের খাল মাঠ ঝোপ জঙ্গল শ্মশান গাছতলা, বিশালাক্ষীর মন্দির, কালো আকাশের বুকে সাদা বলাকার শ্রেণী, তাকে বড় অন্যমনস্ক করে তুলে। আর তখনই চোখ বুজে বসে যায় কখনও বেলগাছের নীচে, কখনও বটগাছের ঝুরির পাশে, কখনও বা শ্মশানের কয়লার গাদায়। তার ভিতরে কি যেন জেগে উঠতে চায় তখন।

কখনও গুনগুন করে গান গায়, কখনও কেষ্টযাত্রা, রামযাত্রার পাঠ, অনর্গল অবিকলভাবে আওড়ে যায়। কখনও ভূতির খালের পাড় থেকে মাটি তুলে নিয়ে গড়তে বসে কালীর মূর্তি।

একদিনের ঘটনা। সেদিনও খাল পেরিয়ে খাল থেকেই এক তাল মাটি তুলে নিয়ে চলে এসেছে মানিক রাজার আমবাগানে। তখনকার আমবাগান—ঘন ঘন আমগাছ—একেবারে আম্রকুঞ্জ। ঐ সব আমবাগানেই রাতের অন্ধকারে তখনকার বিখ্যাত ডাকাতের সর্দার তার দলবল নিয়ে এসে জুটত। দলের সবাইকে নির্দেশ দিত, ডাকাতির পর বখরা ভাগ করত। আর দিনের বেলায় চারপাশের গোচরভূমিতে পাল পাল গরু ছেড়ে দিয়ে সেই আম-গাছের নীচে জটলা করত রাখাল বালকেরা। ঐ সব রাখাল আসত কামারপুকুর থেকে, পার্শ্ববর্তী ভুরসুবা থেকে; আসত দেড় মাইল তফাতে আনুড়, তাজপুর গ্রাম থেকে।

সেদিনও আমতলায় জটলা করছিল ঐ সব রাখাল, মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে এসে।

এদিকে গদাধরও একতাল মাটি, চিয়াড়ি, টাটি ভর্তি জল, এইসব নিয়ে এসে হাজির আমতলায়।

রাখালদের সঙ্গে গদাধরের খুব ভাব। আসতেই তারা ডাকল—এস দাদাঠাকুর, আমরা তোমার কথাই ভাবছিলুম।

—বলিস কি রে! আমার কথা ভাবছিলি? তা আমার কথা কী ভাবছিলি?—গদাধর জিগ্যেস করে।

—এই ভাবছিলাম, তুমি যদি আসো এ সময় তাহলে বেশ জমে আমাদের আড্ডাটা।—একজন জবাব দেয়।

—তাই নাকি রে শালা। তা লাগা না তোদের বাঁশির সুর। আমি ঠাকুর গড়ি।

তারপর চলতে থাকে ঠাকুর গড়া।

—বেশ, বাজাচ্ছি বাঁশি, তুমি গড়ো। তা কালীঠাকুর গড়বে তো?

—হ্যাঁরে, কালীঠাকুর গড়তে আমার খুব ভাল লাগে কি না।

—তা দেখ দাদাঠাকুর, মা কালীর জিবটা কিন্তু বেশ বড় করে কর কেমন?

—আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে শালা, এই ছ্যাখ এমনি করে করে দেব।—নিজের জিবটা অনেকখানা বের করে দেখায়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঐ রকম। সম্মতি জানায় রাখালেরা।

তারপর চলতে থাকে ঠাকুর গড়া। মাটি দিয়ে মোটামুটি ঠাকুরের দেহটি দাঁড় করিয়ে তারপর চলতে থাকে চিয়াড়ির কাজ। ক্রমশঃ প্রতিটি খাঁজে নিখুঁতভাবে চিয়াড়ি টেনে দেয়। জল দিয়ে, কানি দিয়ে কখনও বা পালিশ করে দেয়। রাখালের বাঁশির সুরে সুরে মূর্তির অঙ্গে অঙ্গে ভাঁজ পড়ে। জীবন্ত হয়ে ওঠে দেবীমূর্তি। লকলকে জিব বের করে কালী যেন জ্বলজ্বল করে চেয়ে দেখে।

রাখালেরা চমৎকৃত হয়ে যায়।

গদাধর জিগ্যেস করে—কিরে কেমন হোল বল্?

বাঁশি থামিয়ে একটি রাখাল উত্তর দেয়—খাসা হয়েছে দাদাঠাকুর! খাসা হয়েছে!

—হবে না ? খাসা হতেই হবে। দেখছিস ও কত রক্ত খেয়েছে !

—রক্ত ? রক্ত কোথায় দাদাঠাকুর ?—বিস্ময় প্রকাশ করে রাখালেরা।

—কেন রে, রক্ত দেখতে পাচ্ছিস না ? ঐ যে রে ওর জিব বেয়ে অত রক্ত গড়িয়ে পড়ছে !

—ও, ওই রক্ত ? আমরা মনে করলুম সত্যি করে রক্ত। ও তো জিবের ডগায় মাটির রক্ত করে দিয়েছ গো।

—দূর শালা, ও মাটির কোথা রে ? ও তো আসল রক্ত। দেখছিস না ও কেমন সাক্ষাৎ দাঁড়িয়ে আছে ! জীয়ন্ত রে।

—বল কিগো দাদাঠাকুর ! মাটির ঠাকুর আবার জীয়ন্ত হতে যাবে কেন ?

—দূর শালা। ওকে তোরা মাটির ভেবে বসে আছিস ?

—তা নয়তো কি ? আমরা এতগুলো ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে দেখলুম তুমি ভূতির খালের মাটি দিয়ে ঠাকুর গড়লে, আর সেই ঠাকুর জীয়ন্ত হয়ে গেল ?

—ও, তাহলে বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা দেখবি ? বেশ, তবে ছাখ।

এই বলে হাতের চিয়াড়িটা গেঁথে দিল মূর্তির গায়ে, আর তাজ্জব হয়ে গেল সবাই ! রাখালদের চোখগুলো বিস্ময়ে ইয়া বড় বড় হয়ে গেল। এ কি দেখছে তারা ! এ যে রক্ত ! খোঁচা মারতেই যে মাটির ঠাকুরের গা বেয়ে গলগল করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে ! এ সব তারা স্বপ্ন দেখছে নাকি ! চারদিকে তাকায় সব। এই তো গাছ—মানিক রাজার আমবাগান। ওই তো ভূতির খাল। ওই দূরে তাদের গরুগুলো তো দিব্যি ঘাসে চরে বেড়াচ্ছে। চারদিকে রোদ—ভর দুপুরবেলা। তারা তো কৈ স্বপ্ন দেখছে না। এ তো সত্যি ! তবে কি গদাধর ঠাকুরের কালী জীয়ন্ত ! সকলের চোখে চোখে সেদিন বিস্ময় উপচে পড়ছিল।

এই ঘটনা কোন রামকৃষ্ণের জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যাবে না, কিন্তু তাই বলে একে অবিশ্বাস করাও যায় না। কারণ সেদিনের ঘটনার সাক্ষী ছিল। সেদিন যে রাখালগুলি গদাধরের এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিল তাদের একজনের মুখ থেকে শোনা যায় এই কাহিনী। ঘর তার তাজপুর গ্রামে—কামারপুকুর থেকে মাইল দেড়েক তফাতে। নাম তার গুঁইরাম বাগ, ডাক নাম—গুঁয়ে। যখন সে এ কাহিনী বলে চলেছিল তখন তাকে অবিশ্বাস করার সাধ্য কি ? সে যে তখন অশীতিপর বৃদ্ধ—গাঁয়ের সাদাসিধে মানুষ—তখনকার স্বাভাবিক ধর্মপ্রাণতা, ঈশ্বরমুখী মন তার মধ্যে যে তখন সুন্দর বর্তমান।

মহাপুরুষদের সব কীর্তি, সব বিভূতিই তো গ্রন্থে ধরে রাখা যায় না, অনেক কিছুই অপ্রকাশিত থাকে। লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁরা কত কীর্তি করে থাকেন। ঠাকুরের এই অপ্রকাশিত অলৌকিক কীর্তির পরিচয় পেয়ে সকলে আর একবার তাঁর দিব্যজীবনের কথা ভেবে ধন্য হবেন—এই বাসনা।

"৺মণি ধর স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

অলৌকিক

শশাঙ্কশেখর ঘটক

'ওরে—ওরে—ধর—ধর—শালা পড়ে গেল যে !

আমাদের কাছে অলৌকিক মনে হলেও তত্ত্বজ্ঞ ঋষিদের কাছে তা ছেলে-খেলা। তাঁদের বিরাট মন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। সেইরকম একজন জগৎ-প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনের বিস্ময়কর একটা ঘটনার কথা বলছি।

একদিন কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন মশায় ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব দ্বাদশ মন্দিরের এক দিককার সিঁড়ির উপরে বসে কথাবার্তা কইছিলেন। মন্দিরে প্রতি-দিনই লোক সমাগম হয়। যে দিনের ঘটনা বলছি সে দিনও অনেক লোক আসছিল। এমন সময় বালি, উত্তর-পাড়া, কোন্নগর অঞ্চলের কয়েকজন ভক্ত বাগানে বেড়াতে এসে সেই উঠান দিয়েই যাচ্ছিল। তারা সবাই চাকরি করেন। যাবার সময় একজন আর একজনকে দেখিয়ে বলল, 'ঐ দেখ, রাসমণির পূজারী রামকৃষ্ণ ঠাকুর।' লোকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'হাঁ, হাঁ, দেখেছি, দেখেছি ;—বড় বাড়ির কুকুরটারও মান আছে ; ঠাকুর তো ঠাকুর।'

এই কথা শুনে অপর দু একজন বলল, 'ছি ছি! ও কি কথা! তোমার কি একটু আক্কেল নেই? রামকৃষ্ণ যে একজন বড় সাধক।'

এমন সময় তাদেরই একজন আর কথা না বাড়িয়ে 'ওরে থাম না' বলে তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

এই কথা শুনে কবিরাজ মশায়ের মাথা লজ্জায় নীচু হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে লোকগুলি কালী দর্শন করে পঞ্চবটীর দিকে গেল।

হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেব চিৎকার করে উঠলেন, 'ওরে—ওরে—ধর—ধর—শালা পড়ে গেল যে ; ওঃ—মা—মা !' বলেই তিনি সমাধিস্থ হলেন।

রামকৃষ্ণদেবের হঠাৎ চিৎকারে কবিরাজ মশায় ভয়ে শিউরে উঠলেন। তিনি দেখলেন যে ঠাকুর নিশ্চল, স্থির, পাষাণবৎ। কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। কবিরাজ মশায় এর কোন কারণ ঠিক করতে না পেরে ঠাকুরের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন যে একজন লোককে আর কজনে মিলে ধরাধরি করে নিয়ে এসে একেবারে ঠাকুরের পায়ের কাছে রেখে হাতজোড় করে বলতে লাগল, 'ঠাকুর ! ক্ষমা করুন, রক্ষা করুন ; প্রাণে বাঁচান।' কবিরাজ মশায় এসব দেখে অবাক্। যে লোকটি ঠাকুরকে দেখে যা তা বলেছিল সে লোকটিকে অজ্ঞান অবস্থায় ওরকম করে আনতে দেখে কবিরাজ মশায়ের আনন্দ ও বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে লোকটির ?' একজন বললেন, 'পঞ্চবটী তলায় হোঁচট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েই অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমাদের অনেক চেষ্টাতে কিছুতেই কিছু হল না। পঞ্চবটীতে একজন সাধু আছেন। তিনি বললেন—ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাও। তাই নিয়ে এসেছি। ইনি এখন ধ্যানে আছেন ? আপনি একটু দয়া করে বলুন না, যাতে এর জ্ঞান হয়, রক্ষা পায়, তাই করতে।'

কবিরাজ মশায় এই শুনে আরো অবাক্ হয়ে গেলেন। কারণ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যেস্থানে বসেছিলেন সে স্থান থেকে পঞ্চবটী ছিল দূরে এবং দৃষ্টির অগোচরে, কিন্তু ঠাকুর তো দিব্য চক্ষে সবই দেখতে পেয়েছিলেন।

বাবুরা সব হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় ঠাকুর বলে উঠলেন, 'বেটা ! মায়ের প্রসাদ খাবে না ; কি আস্পর্ধা ! বেটাদের ঠাকুর দেখতে এসেও কত ভেদাভেদ, জাতকুল বিচার ? দেখ না ? এখন রাসমণির কালী কী বলে ? যা শালারা মায়ের কাছে নিয়ে যা, আমি কি করব ?'

এ কথা শুনে সবাই ঠাকুরের পায়ে পড়ল। ঠাকুরের কি অলৌকিক দর্শন ! কি অদ্ভুত ভাব !

ঠাকুরের পায়ে পড়ায় ঠাকুর লাফিয়ে উঠে দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন দেখে সবাই কেঁদে ফেলল। ঠাকুর বললেন, 'দৌড়ে গিয়ে ৺মায়ের প্রসাদ আর চরণামৃত মুখে দে ; মেয়েদের মত কাঁদলে কি হবে ? মায়ের কৃপা ছাড়া আমার বাবারও শক্তি নেই ওর কিছু করে ; যা—যা—৺মায়ের চরণামৃত খাওয়ালে ভাল হবে ; যা।' একজন ছুটে গিয়ে চরণামৃত আর কিছু প্রসাদ মুখে দিতেই বাবু চোখ মেলে চাইলেন, সকলের ধড়ে প্রাণ এল।

———

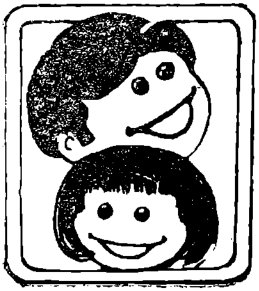

মজার পাতা

নতুন ধাঁধা

১। মুণ্ড পুচ্ছ বাদ করে
গরুর পুচ্ছ দাও উদরে।
ঘোর শত্রু অগ্নি যাহার
বল দেখি নামটি তাহার?

—সুপ্রকাশ, শ্রীজীব ও সঞ্জীব আচার্য, পাড়া, পুরুলিয়া।

২। বুদ্ধি ও আশীর্বাদ
মৎস্যরাজ্যে ঘটায় প্রমাদ। —শ্যামল, বিমল ও অমল গোস্বামী, চিরকুণ্ডা।

৩। মন্দ ছাড়া হাতে ভাল
শেষ হ'য়ে শেষ,
সমস্তটা বলছি শোন
ফুলটি বটে বেশ। —পুণ্ডরীকাক্ষ হাজরা, ছড়রা, পুরুলিয়া।

গত শ্রাবণ সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। ভূত

২। চাষী কড়াইটি জলে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ভাসমান কড়াই-এর ওপর ১টি বা ২টি কোদালও বহন করা যায়।

৩। চাকর মহাজনের কাছ থেকে ১৬ টাকার খুচরা নিয়ে ৪ টাকা বাটা দেবে এবং নিজে ১ টাকা নিয়ে বাবুকে ১৫ টাকা দেবে।

গত শ্রাবণ সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—বাবলী, কাকলী, সোনালী, মিণ্টু, তানা ও টুবলুন রাহা—পূর্ব সিঁথি রোড; অশোক, অলোক, অসীম, অসিত ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন; টুটুল, কেয়া, ঝুমা ও পুলক গাঙ্গুলী—রানী হর্ষমুখী রোড; দীপা, রাণা, চন্দ্রন, চন্দ্রা ও মেরী গাঙ্গুলী—এন. জী. বসাক রোড; সমীরণ ও সঙ্গীতা রায়—গরচা ফার্স্ট লেন; পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য ও অভিজিৎ চক্রবর্তী—বিবেকানন্দ নগর; বিশ্বনন্দন, ডল, স্মৃতি ও কবিতা দাশ—গর্চা ফার্স্ট লেন; বৌদি, পরেশ, সন্দীপ, অমল ও সন্তোষ রায়—জামীর লেন; পিকলু, টুবলু, তোতন ও টুলটুন—পূর্ণ মিত্র লেন; টুবলু ও অপু—গোবিন্দ আঢ্য রোড; শর্মিষ্ঠা ও সুস্মিতা শীল—গোবরা রোড; স্বপন, মনা, বুনু ও তপন দাশ—লালগড়; সোনালী ও তাতু রায়—কবীর রোড; বাবা, বাপী, গোপা, দিদি ও নোটন—বেলঘরিয়া; অমরগোপাল বরাট—চিত্তরঞ্জন এভেনিউ; রীণা, রীতা, অমর, অসিত ও অলক চট্টোপাধ্যায়—তালতলা এভেনিউ।

২৪ পরগনা—দেবাশীষ, স্নেহাশী, নিবেদিতা, টুটু ও

জ্যেঠু—কাঁচড়াপাড়া ; নীলরতন মুখার্জী—শ্রীপল্লী ; অসিতবরণ পাল ও শান্তিময় হাজারী—আমতলা ; বাপী, ভাইয়া, বিশ্বজিৎ ও ত্রিলোচন ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া ; নীলাদ্রি, হিমাদ্রি, বৈশাখী ও ধীমান নাহা—বিরাটী ; কল্লোল, মিঠু, মিনা, কজ্জল, সজল, পল্লব, রত্না ও মদনদা—(?) ; বীথি ; নিতি, ইতি, তমাল ও শ্যামল—গড়িয়া ; মদন, মহেশ, মনোজ, মীনা, মধু প্রভৃতি—বসিরহাট ; দীপা ও স্বাতী—নিমতা রোড।

হাওড়া—মা, চাঁদু, নাদু, খাঁদু, দীপ্তি, প্রীতি ও স্মৃতি—শালিখা ; জয়শ্রী, সুব্রত, জয়ন্ত, বনশ্রী, মুকুন্দ ও আরতি—ভট্টাচার্যপাড়া লেন ; খোকা, সুশান্ত, মিঠু, ফুলটু ও বিলটু—কাসুন্দিয়া রোড ; চন্দন, চন্দ্রনাথ, তাপস, সিদ্ধার্থ ও বাপী—কানপুর ; বিমানকাকু, খুকু, লিসা, ভাইসোনা, পাপুল প্রভৃতি—ইচ্ছাপুর রোড।

হুগলী—অরূপ, অনুপ, অলক, শ্যামল, মা, বাবা ও ধনঞ্জয়—চুঁচুড়া ; বুকু, বুতু, মিঠু ও পিঁপিঁ ঘোষাল—চন্দনপুকুর ; সমীর, সলিল, ছন্দা ও সীমা বসু—বৈষ্ণবাটী ; রীণা, লীনা ও অসীম—শ্রীরামপুর ; বাণী, ইন্দ্রাণী, দেবাশিস ও চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া ; প্রদ্যোৎ মুখার্জী—রিষড়া ; স্বপন, সুনীল, কবিতা ও সঙ্গীতা পাড়ুই—সিঙ্গুর ; সন্তোষ, সত্য, রাজু, পবন, সুভাষ, দীপু ও বাবা চন্দননগর ; টুলটুল, গৌতম ও দেবকুমার—উত্তরপাড়া ; পঞ্চানন দে—উত্তরপাড়া ; বিশ্বজিৎ, কাঞ্চন ও শ্রী—ইটাচুনা।

বর্ধমান—শ্রাবণী, কাকলী, বিপ্লব, বিভাস, বিকাশ প্রভৃতি—বীরহাটা ; সুস্মিতা, রাণা ও মধুমিতা দাশগুপ্তা—ধাদকা পলিটেকনিক ; শুভাশিস ব্যানার্জী—চিত্তরঞ্জন ; গুনু, বুবু, পেনো, শচী, বৌদি ও পাপু—সন্ধিপুর ; বুদান, বুড়ি, ডলি, মা ও বাবা—কালনা ; বিক্রমরঞ্জন মজুমদার—চিত্তরঞ্জন ; শাতু, কার্তিক, গুরু, শশাঙ্ক, জীবন ও গীতা নূতনগঞ্জ ; লান্টু, সোমা, দীপা ও বাচ্চু—কালনা ; শান্তনুকুমার দাঁ—বুধাগ্রাম ; নমিতা, শ্যামল, সমর, রাজীব ও রূপম মল্লিক—দুর্গাপুর-৫ ; অশোককুমার ঘোষ—আসানসোল ; শিঙ্কু, রিঙ্কু ও পিঙ্কু—দুর্গাপুর ; তরুণ, জ্যোতিরেখা, স্মৃতি, সোমনাথ ও সুদীপ্ত—কালনা ; গোপা, রূপা, রাণা, ছিবলী, সোনা, নীলু ও হাজরাদা—রানীগঞ্জ ; মলয়া, জয়া, ছায়া, সৌমিত্র ও মিঠু—কুলটী।

মুর্শিদাবাদ—পিলসীমা ফ্রি প্রাঃ স্কুলের ছাত্রবৃন্দ—জয়পুর।

মেদিনীপুর—শৈলজাকুমার পাত্র—ধুইপাড়া ; নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়—হরিবপুর ; প্রতীপ, অতনু, ফাল্গুনী ও কৃষ্ণা—রাউতারাপুর ; শিবু, দেবু, তুলসী ও চকমকি—পাটনাবাজার ; স্বপ্না, অঞ্জন, সঞ্জয় প্রভৃতি—গড়বেতা।

বাঁকুড়া—বিকু, বন্টু, লান্টু, মিঠু ও বাপী দে—সোনামুখী ; অসিত, দিলীপ ও গুরুপদ আচার্য—সোনামুখী ; বাবা, মা, প্রশান্ত, কল্যাণী ও পার্থ—মুক্তাতোড় ; শঙ্কু, বিপ্লব, স্বর্ণ, অলকা, শম্পা ও উত্তমকুমার বটব্যাল ; স্বপন, তপন, গোপু, মনু ও মা—বাঁকুড়া।

বীরভূম—চঞ্চল, কল্যাণ, মিতা, শম্পা ও চন্দন—আমোদপুর ; হাসি, শিবু, টুটুল, শ্যামল প্রভৃতি—রামপুরহাট ; সুব্রত, সুতপা ও সুমনা হাজরা—আহমদপুর রেল স্টেশন।

পুরুলিয়া—পুণ্ডরীকাক্ষ হাজরা ও তপেশচন্দ্র মাজী—ছড়রা ; চুমকী, দোলন, বুনা, টুকু ও বাবন—মধুতটী ; দিলীপ চৌধুরী—মধুপুর ; চিন্ময়, মা, বাবা, দাদা ও কাকুরা মধুতটী ; মানতকুমার সেন—মধুপুর ; মা, বাবা, দাদা, বৌদি, বড়ন, ছোটন ও শান্তনু—রঘুনাথপুর ; কানাই, নিতাই, মাণিক, অরুণ, সুভাষ ও অভয়—আসনবনী ; পার্থপ্রতিম ও দীপ্তিমান মাজী—ঝাপড়া ; শুভ্রা, সুদত্তা ও কৌশিক ভট্টাচার্য—আদরা।

জলপাইগুড়ি—নন্দিনী, সোনালী, শুক্লা, মন্টা, বাবলু ও হীরক—আলিপুরদুয়ার জংশন ; প্রণব ও প্রবীর বিবাড়—হ্যামিল্টনগঞ্জ ; বিজয় ভট্টাচার্য—বীরপাড়া।

দার্জিলিং—রতন বর্মন রায়—শিলিগুড়ি।

বিহার—মানত, হারাধন, প্রণব ও তাড়িত—কদমা ; সনৎ, বাণী, ছন্দা, রত্না, রুমঝুম ও কুমকুম—চিরকুণ্ডা ; অসিত, রণজিৎ, জয়া, রীতা, মা ও বাবা—কুমারডুবি ; বাবা, মা, কল্যাণ, শিখা, মল্লিকা, বিশ্বজিৎ, সুতপা ও মিতা—হাজারীবাগ ; নিশীথ, অসিত, তড়িৎ ও অমিত—ঘাটশীলা ; উত্তম, গৌতম, রজত, কল্যাণ ও বনশ্রী সেনগুপ্ত রাঁচী-৯ ; তৃপ্তি ও ধীরেন নামাতা—কানিকাপুর ; অরুপ, ফটিক, নমিতা, অনিতা ও রেখা গড়াই—চিরকুণ্ডা ; তনুশ্রী, বনশ্রী ও রুবেন করগুপ্ত—জামসেদপুর-৫ ; স্বপন, কবিতা, তরুণ, বাবা ও মা—রাঁচী।

আসাম—সোমা, রুমা, বুবু, টুটু, মিঠু, পান্না প্রভৃতি গৌহাটী-৮ ; হীরক, জুয়েল ও ঝুমা ঘোষ—নিউ বঙ্গাইগাঁও ; বাবা, মা, দীলু, বাচ্চু, গীতা, বাবলু প্রভৃতি—আটগাঁও ; বিপুল, পটু ও টুলু—মরিয়ণী ; বাবা, মা, ভারতী ও তপন সেন—নুনমাটী।

মধ্যপ্রদেশ—গোপাল, খোকন, রীণা ও খোকা—বিলাসপুর।

কলিকাতার হাজরা রোড হইতে শ্রীসন্তোষকুমার দে তাঁর স্বর্গগত পিতা শ্রীপদ দে-র পুণ্যস্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন।

তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺শ্রীপদ দে স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু :

রামায়ণের একটি ভক্তিমূলক আখ্যান

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ : ৩০শে কার্তিক ১৩৮০। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী মাঘ সংখ্যা শুকতারায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার—দশ টাকা ● **দ্বিতীয় পুরস্কার—পাঁচ টাকা**

বাজারের সেরা অভিধান—

সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত

নূতন মুদ্রণ

সরল বাঙ্গালা অভিধান মূল্য টা. ২৮'০০

ডাকমাসুল সহ টা. ৩৩'০০ স্থলে টা. ২৮'০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Century Dictionary (ENG.-BENG.) Price Rs. 13·00

Century Dictionary (BENG.-ENG.) Price Rs. 13·00

ডাকমাসুল সহ টা. ১৬'০০ স্থলে মাত্র টা. ১৩'০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Pocket Dictionary (ENG.-BENG.)
Pocket Dictionary (BENG.-ENG.)
} শীঘ্রই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে

NEW BENGAL PRESS (Private) Ltd., 68, College Street, Calcutta-12

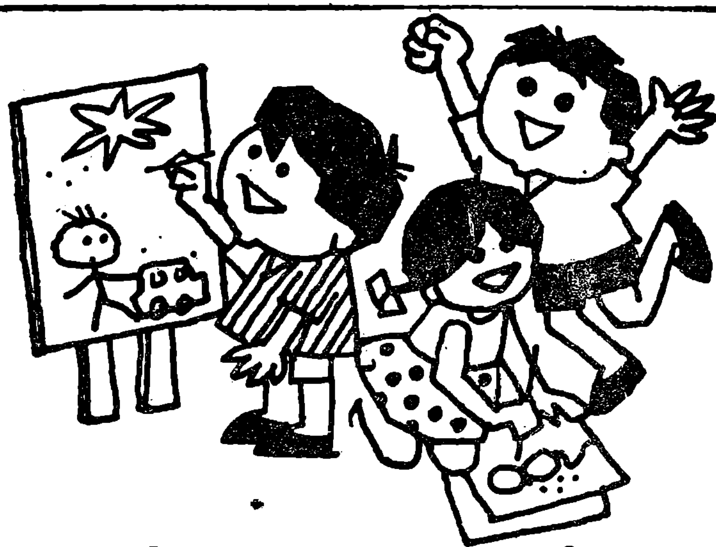

রঙের ঘটায় রঙের ছটায়
জীবনে আনন্দ ডাক দিয়ে যায়

এসো এসো, সবাই এসো খেয়াল খুশির মজার খেলায় ক্যামলিনের রঙের মেলায়।
মনের মত রঙ ছড়িয়ে ফুটিয়ে তোলো, কল্পনার জল্পনা··· আনন্দের আল্পনা!

ওয়াটার কালার টিউবস

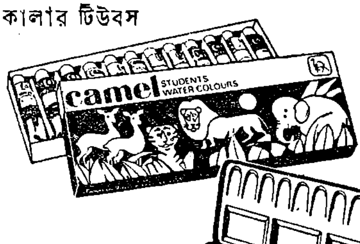

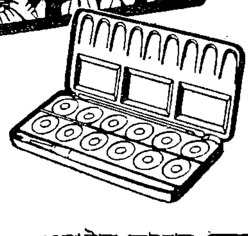

ক্যামেল
আর্ট কালার্স

ক্যামলিন
প্রাইভেট লিমিটেড
জে. বি. নগর,
বোম্বাই ৪০০ ০৫৯ (ভারত)

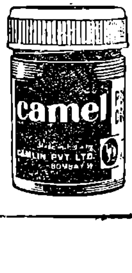

ওয়াটার কালার কেক্‌স

পোস্টার কালার

PRATIBHA 1712-12-BEN

এই চায়ের জনপ্রিয়তা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে আপনাদের চাহিদাতেই

লিপটনের রুবি ডাস্ট

লিপটনের রুবি ডাস্ট চা রাতারাতি লোকের মন জয় করলো কেমন করে—বলুন তো ? এর মূলে কিন্তু আপনারাই। কেননা, আপনারা চান এমন চা—যার প্রতি প্যাকেটে পাওয়া যাবে ঢের বেশি কাপ চা, গাঢ় লিকার আর মনমাতানো স্বাদগন্ধ।

লিপটন বলতেই ভালো চা
LIPTON

একমাত্র প্যাকেটের চা-ই থাকে তরতাজা, থাকে স্বাদেগন্ধে ভরপুর

প্রতি প্যাকেটে পাবেন ঢের বেশি কাপ চা
তাই এর কদর দিন দিন বেড়েই চলেছে

LRDC-8/73 BEN

বাড়ন্ত বয়েসের ছেলেমেয়েদের সাথী-ইনক্রিমিন*!

বাড়ন্ত বছর কটা সবসময় আপনার ছেলেমেয়েদের খেতে দিন ইনক্রিমিন টনিক। ইনক্রিমিন সিরাপে রয়েছে—উপকারী সব ভিটামিন, আয়রন আর শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড—স্বাস্থ্যের পক্ষে সব অপরিহার্য্য দ্রব্য।

ইনক্রিমিন*

ইনক্রিমিন টনিক - বাড়ন্ত বয়েসের ছেলেমেয়েদের জন্যে অতুলনীয়!

ডাক্তারদের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম Lederle সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিভাগ।

*আমেরিকান সায়নামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

SISTAS-INC-3066A BEN

হাতের লেখা ভাল করবে
খোকন করে পণ
মুখ গুমরে বসে আছে
মন উচাটন।
কলমটাও ভালই আছে
কালিও আছে কত
তবে কেন হয় না লেখা
কবি দাদুর মত
পাড়ার পিন্টু বলে তাকে
শোন খোকন ভাই
হাতের লেখা ভাল করতে
সুলেখা কালি চাই।
সুলেখা কালি, সুলেখা কালি
মনের কথা তোমায় বলি
তোমার রং বড়ই মধুর
লেখা যেন
কবি দাদুর।
সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা • গাজিয়াবাদ

নতুন—ফসফোমিন নির্মাতাদের দ্বারা তৈরী আরেকটি উৎপাদন

ফসফোমিন আয়রন

...কারণ মেয়েদের জন্যে আয়রনের বেশী প্রয়োজন হয়

মেয়েদের জন্যে আয়রনের দরকার অনেক বেশী। কারণ প্রতি-মাসে তাঁদের শরীর থেকে আয়রন বেরিয়ে যায়। শরীরের পক্ষে আয়রন খুবই দরকার। তাই আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করাও প্রয়োজন।

গর্ভাবস্থায় আর শিশুকে স্তন্যপান করাবার সময় প্রত্যেক স্ত্রীলোকের আরো বেশী আয়রনের প্রয়োজন হয়। কারণ সন্তানের জন্যেও তো আয়রনের দরকার!

আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করতে আর শরীরে যথাযথ মাত্রায় আয়রন বজায় রাখতে আপনি নিন ফসফোমিন আয়রন—প্রতিটি নারীর জন্যে একটি অত্যাবশ্যক টনিক।

ফসফোমিন আয়রন স্বাস্থ্যকর লাল রক্ত-কণিকা গড়ে তোলে আর আপনার যৌবনশ্রী ফিরিয়ে আনে।

ফসফোমিন আয়রনে সব ভিটামিন ও খনিজ পদার্থও পাবেন। ফলে আপনি হয়ে উঠবেন যেমন কর্মঠ তেমনি প্রফুল্ল।

আজ থেকেই ফসফোমিন আয়রন খেতে শুরু করুন। প্রত্যেক দিন নিন ফসফোমিন আয়রন

সব কেমিস্টের দোকানে ২টি সাইজে পাওয়া যায়:
২৪০ মি. লি. ও ৪৮০ মি. লি.।

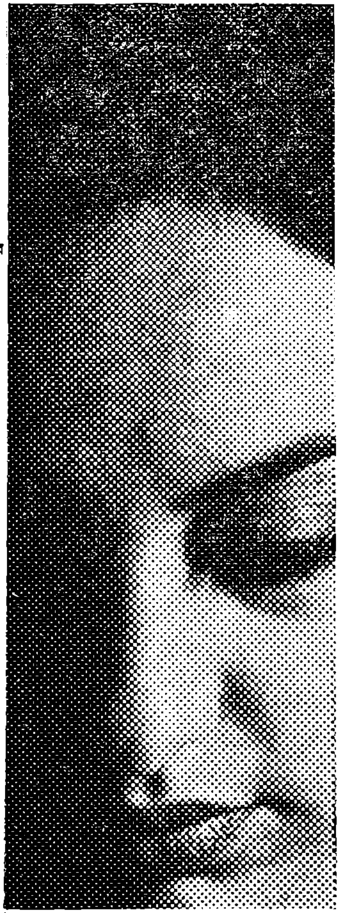

নতুন!
ফসফোমিন আয়রন—
মেয়েদের জন্যে বিশেষ
ফর্মূলায় তৈরী
প্রথম টনিক

SQUIBB SARABHAI CHEMICALS

ফসফোমিন করমচাঁদ প্রেমচাঁদ প্রাইভেট লিমিটেডের একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
® ই. আর. স্কুইব অ্যাণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক আর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকর্তা হলেন কে পি পি এল।

Shilpi-HPMA-7A/73 Ben

ছুটির পরেই হিমক্রীম
আইস ক্রীম
হিমক্রীম
DIRECTORATE OF DAIRY
হিম ক্রীম আইস ক্রীম
খাঁটি দুধের তৈরী—
মোলায়েম আর মিষ্টি মধুর
আস্বাদে ভরা।
ডিরেক্টরেট অফ
ডেয়ারী ডেভেলপমেণ্ট
পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রস্তুত।
IPB/DM/4-73B

অবাধ খুশির আবরণে
ছোটোদের বাড়ন্ত পা
বড়োদের চাইতে ছোটোরাই অনেক অনায়াসে ঠিক জিনিসটা বেছে নিতে পারে। তাই ওদের বাটার জুতো এত পছন্দ। বড়োরাও সায় দেন। কেননা, বাটার জুতো কচি পা'কে যেমন আরামে জড়িয়ে রাখে, তেমনি বাড়বারও স্বাধীনতা দেয়। রঙ, ডিজাইন, পরার আরাম, মজবুতি—সবদিকে চোখ রেখে বাটার জুতো তৈরি। ছোটোদের মনমতো জুতো বেছে নিতে দিন। দেখবেন ঠিকটি বেছে নেবে।
বাহার ১৮
৪.২৫
মোকাসিন ৯৫
৫.৫০-৬.৫০
বাবলা ৫২
৫.৯৫-৬.৯৫
বুলবুল ১৭
৮.৯৫
বাফু ৮৭
১০.৫০
বুটি ৩১
১০.৫০
Bata

দেড়ো-ডাক্তারের ফ্যাসাদ
গল্প • অদ্রীশ বর্ধন ছবি • নারায়ণ দেবনাথ
দেড়ো-ডাক্তারকে রাজ্যিশুদ্ধ লোক ভক্তি শ্রদ্ধা করত দুটো কারণে। প্রথমতঃ, তাঁর ওষুধ পড়লেই লম্বা দিতো যে কোনো রোগ— অক্কা পেতো রোগজীবাণু। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর দাড়ি দেখতে লোক আসত দেশ দেশান্তর থেকে। আহা, সে দাড়ি দেখবার মত দাড়ি। ডাক্তারের দুগুণ লম্বা তেমনি মোটা! অথচ বিখ্যাত এই দাড়ি নিয়েই দেড়ো ডাক্তার পড়লেন এক মহা ফ্যাসাদে!
একদিন গভীর রাতে।
ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!
ইস! এত রাতে আবার কে ডাকাডাকি করে!
দরজা খুলে দেখলেন এক থুত্থুরে বুড়ো।
ডাক্তারবাবু! আমার মেয়ের কঠিন রোগ হয়েছে! কিছু খেতে চাইছে না। আপনি ওষুধ দেবেন চলুন!
আশ্চর্য! বৃষ্টি নেই তবু এ দেখছি ভিজে ঢোল হয়ে এসেছে!
দেড়ো-ডাক্তার কাউকে না বলতেন না। তাই অত রাতেও ওষুধের বাক্স নিয়ে বেরোলেন বুড়োর সঙ্গে।
শহরের ধারে একটা ভাঙা বাড়িতে এসে পৌঁছালো দুজনে।
মরেছে! এ যে হড়বড় করে কুয়োয় নেমে গেল! মনে হয় শুকনো কুয়ো, দেখি উঠে!
ও বাবা! এতো কানায় কানায় ভর্তি! ব্যাপার সুবিধের নয়, এই তালে সরে পড়ি!
কিন্তু পালাতে যেতেই
হাঃ হাঃ হাঃ! আমার মেয়েকে ওষুধ না দিয়ে যাবে কোথা?
কে তুমি?
পাতাল-জাদুকর মোবাটা!

মোবাটা! ওরে বাবা! তোমার জাদু দিয়ে সারাও না মেয়ের অসুখ।
জাদুতে সারছে না!
কি হয়েছে বললে মেয়ের?
খাচ্ছে না কিছু!
কেন?
খেলেই পেটের অসুখ হচ্ছে — হাতের ময়লা পেটে চলে যাচ্ছে।
সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিক।
এমনি সাবানে কিচ্ছু হচ্ছে না — হাতের রোগজীবাণু মরছে না। অসুখের ভয়ে না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে এসেছে আমার বাছা!
এই কথা!
খাবার আগে রোজ এই সাবান দিয়ে মেয়েকে হাত ধুতে বলবে। পেটের অসুখ ধারে কাছেও ঘেঁসবে না। খেলেধূলে এসে মাখতে বলবে— চামড়ার রোগ দূরে থাকবে!
দাড়ি ছেড়ে দিলাম। মেয়ে যদি ভালো হয়, এক বস্তা সোনার মোহর পাবে। না হলে তোমার দাড়ি আমার গালে আসবে।
কিছুদিন পর সকালে
আরি ব্বাস! মোহরের সঙ্গে একখানা চিঠিও রয়েছে। দেখি কি লিখেছে!
ডাক্তার— আরো কিছু বেনজিটল সাবান কুয়োর পাড়ে রেখে এসো। ভারী উপকারী সাবান। পেটের রোগ আর হচ্ছে না আমার মেয়ের— চামড়ার রোগকেও সে আর ডরাচ্ছে না।
পাতাল-জাদুকর 'মোবাটা'
Benzytol SOAP
ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

দুর্মদ জাহানকোষা আজ অতীতের স্মৃতি

জাহানকোষা। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সেরা হাতিয়ার। আজ অতীত গৌরবের স্মৃতিমাত্র। অতীতের মুর্শিদাবাদ—ঐশ্বর্য আর বিলাসের লীলাভূমি। যেখানে অতুলনীয় দেশপ্রেম আর ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্র একই সঙ্গে পাশাপাশি চলেছে সমান গতিতে। এখানে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র স্মৃতিসৌধ, যা আপনাকে মনে করিয়ে দেবে নবাবী বাঙলার গৌরব-গাঁথা আর তার পতনের বেদনাময় ইতিহাস। এছাড়াও আজকের মুর্শিদাবাদে আপনি পাবেন অতীত ঐতিহ্যের স্মারক সূক্ষ্ম কারুকার্যে অসাধারণ হাতির দাঁতের জিনিস পত্র আর সিল্কের শাড়ি। আসুন, চলুন মুর্শিদাবাদ। দেখে নিন নবাবী আমলের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি। রাত্রিবাসের জন্যে রয়েছে বহরমপুর ট্যুরিস্ট লজ। সেখানে পাবেন আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য আর আরাম।

বিশদ বিবরণের জন্যে যোগাযোগ করুন:

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ইস্ট, কলিকাতা-১
ফোন: ২৩-৮২৭১৮ গ্রাম: TRAVELTIPS
স্বরাষ্ট্র (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নূতন কলেবরে বাহির হইতেছে—

● শিশু-সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের ●

আবোল তাবোল—	৩'০০	পাগলা দাশু—	৩'০০
হ-য-ব-র-ল—	৩'০০	বহুরূপী—	৩'০০
খাই খাই—	৩'০০		
লক্ষ্মণের শক্তিশেল—	৩'০০	ঝালাপালা—	৩'০০

দেব সাহিত্য কুটীর, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

তপোবন

এবার পূজায়

দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত
পূজাবার্ষিকীর নাম **তপোবন**

তপোবন-এ ছেলেমেয়েদের মন-ভোলান লেখা এবার লিখবেন এদেশের সমস্ত বিখ্যাত সাহিত্যিকরা। তাছাড়া থাকবে ছবিতে গল্প, কার্টুন এবং অসংখ্য একরঙা ও তিনরঙা ছবি।

মূল্য ৮·০০ টাকা

অনামিকা

মধুসূদন মজুমদার সম্পাদিত অনামিকা

নাম **অনামিকা** হলেও বহু নামী লেখকের লেখায় ভরা এই বই ছেলেদের মন ভোলাবে। **মূল্য ৫·০০ টাকা**

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের

গল্প বলি শোন

শোনবার মত গল্প করে বলতে জানেন এই লেখক। কখনও পথ চলতে চলতে, কখনও রূপকথা রাজ্যের মনমাতানো কাহিনী লেখকের লেখনী থেকে বেরিয়ে আসে। এই সব গল্পে ভরা এই বই পূজার এক নতুন উপহার। **মূল্য ৫·০০ টাকা**

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

রোমাঞ্চকর চিত্রকাহিনী

শুধু ছবি আর ছবি। সিনেমার কাহিনীর মত করে আঁকা। অসংখ্য ছবির মধ্যে দিয়ে নানা দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর গল্প বলা হয়েছে। **মূল্য ৫·০০ টাকা**

ছোটদের বুক অব নলেজ

বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশ করেছে ছেলেদের জন্য **বুক অব নলেজ**। যা সত্য তাই বিস্ময়কর। **বুক অব নলেজ** দেখলেই তা বোঝা যায়। **মূল্য ২৫.০০ টাকা**

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা-৯

Registration No. C. 3063 "Suktara"